মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৬, সংখ্যা-১১

ডিসেম্বর ২০১৭ ইং, রবিউল আওয়াল ১৪৩৯ হি., অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৪ বাং

ربيع الأول ١٤٣٩هـ، دسمبر ٢٠١٧م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৪

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩৬... ৫

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৭

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :

মীলাদুন্নবী (সা.) পালনের সঠিক পদ্ধতি........ ৮

“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :

নবীজি (সা.) হাযির-নাযির কি না?........ ৯

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ১২

আল্লামা ড. শায়খ নূরুদ্দীন

সিরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা, উৎস ও ক্রমবিকাশ.... ১৬

মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছাত্রদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন কেন?........ ১৮

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি........ ২০

কারী জসীম উদ্দীন কাসেমী

তালাকের আইনে বিকৃতি ও সংশোধনী -৩........ ২৫

মুফতী শরীফুল আজম

ভিন্ন চোখে কওমি মাদ্রাসা-১৪ .... ৩১

মাওলানা কাসেম শরীফ

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৪

সামগ্রিক জীবনে নবীজি (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ.. ৩৮

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِى فَقَدْ أَحَبَّنِى

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে বলেছেন, সেভাবে যতক্ষণ কোনো মানুষের অন্তরে রাসূল (সা.)-এর আন্তরিক ভালোবাসা এবং মুহাব্বত প্রথিত হবে না, সে মুসলমান হতে পারবে না। এটি স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রমাণিত সত্য কথা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "মুমিনদের পক্ষে নবী তাদের প্রাণের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। আর তাদের স্ত্রীগণ তাদের মা।" (আহযাব ৬), হাদীস শরীফে এসেছে, কোনো লোক ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তাদের কাছে আমি তাদের মাতা-পিতা এবং অন্য লোকদের চেয়ে বেশি প্রিয় না হই। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ) অন্য হাদীসে আছে, তিনটি বিষয় যে ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকবে সেই-ই ঈমানের সাদ পাবে। তার মধ্যে একটি হলো, যার মাঝে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত অন্য সব বস্তু থেকে অধিক থাকে। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত কিভাবে প্রকাশ পাবে? মুহাব্বত ও ভালোবাসা হলো অন্তরের বিষয়। কিন্তু তার একটা প্রকাশ্য দিক রয়েছে। যার মাধ্যমে মুহাব্বতের প্রকাশ ঘটে। রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত প্রকাশেও শরীয়ত নির্ধারিত স্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ الله

আমি রাসূলদের পাঠানোর উদ্দেশ্যই হলো, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা। (সূরা নিসা ৬৪)

অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ الله

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করল। (সূরা নিসা ৮০)

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আমার প্রাণ হতে, পরিবার-পরিজন হতে এবং সন্তান অপেক্ষাও বেশি ভালোবাসি। আমি বাড়িতে থাকি বটে, কিন্তু আপনাকে স্মরণ করা মাত্র আপনার নিকট আগমন ছাড়া আমি ধৈর্যধারণ করতে পারি না। তারপর এসে আপনার সাথে দেখা করি। কিন্তু আমি যখন আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে আপনি নবীদের সঙ্গে সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন, তখন আমার ভয় হয় যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলেও আপনাকে হয়তো দেখতে পাব না।

সাহাবীর এই কথার ওপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় :

وَمَنْ يُّطِعِ الله وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ

"আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তবে তারা ওই ব্যক্তির সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সালেহীনগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরানিসা ৬৯)

হযরত রবীয়া ইবনে কা'আব আসলামী (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) একদিন আমাকে বললেন, তুমি কিছু চাও। বললাম, জান্নাতে আমি আপনার সাথে থাকতে চাই। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, এ ছাড়া অন্য কিছু চাও। বললাম, আমার চাওয়া এটিই। তখন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমার উদ্দেশ্য অর্জনে বেশি বেশি সিজদা করার মাধ্যমে আমার সাহায্য করো। (আবু দাউদ শরীফ হা. ১১৮২)

আরেক হাদীসে এসেছে :

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِى فَقَدْ أَحَبَّنِى، وَمَنْ أَحَبَّنِى كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ

"যে আমার সুন্নাতকে যিন্দা করবে নিশ্চয়ই সেই আমাকে মুহাব্বত করেছে, যে আমাকে মুহাব্বত করেছে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (তিরমিযী শরীফ হা. ২৬৭৮)

এরূপ বহু হাদীস এবং কোরআনের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত প্রকাশের শরীয়তসম্মত পন্থা হলো তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর সুন্নাত মতে জীবন যাপন করা, সুন্নাতে রাসূলকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা এবং রাসূল (সা.) যা নিষেধ করেছেন যেমন–শিরক-বিদ'আত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। যেহেতু রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা শরীয়ত নির্দেশিত বিধান, সেই কারণে যার যার ইচ্ছামতে তাঁর মুহাব্বত প্রকাশ করা যাবে না। বরং স্বয়ং রাসূল (সা.) যেভাবে বলেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম বাস্তবে তাঁকে যেভাবে মুহাব্বত করেছেন সেভাবেই তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। এর একমাত্র পন্থা হলো সুন্নাতে রাসূলের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। জীবনের প্রতিটি স্তরে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের বাস্তবায়ন করা।

নিজে সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সমাজে সুন্নাত চর্চার চেষ্টাকে এহয়ায়ে সুন্নাত বলা হয়। উপমহাদেশে আকাবিরে দেওবন্দের একটি বৃহৎ মিশনই ছিল এহয়ায়ে সুন্নাত। মুসলিম উম্মাহের মধ্যে নববী শিক্ষা ও আদর্শ বিস্তার এবং সুন্নাত প্রতিষ্ঠার মেহনতে তাঁদের আত্মনিবেদন একটি অনস্বীকার্য অধ্যায়। বাংলাদেশেও এই ধারায় মুরব্বিগণ অনেক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) এহয়ায়ে সুন্নাতের কাজকে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন হিসেবেই বেছে নিয়েছিলেন। সুন্নাতের প্রচার-প্রসার এবং সমাজে তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ মেহনতের স্বাক্ষর দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের ভেতর 'খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া আবরারিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন একমাত্র এহয়ায়ে সুন্নাতের উদ্দেশ্যে। এই খানেকাহের সাথে দেশের হাজারো উলামায়ে কেরাম এবং বিশেষ ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট হয়েছেন সুন্নাত শিক্ষা এবং নিজেদের মধ্যে তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। কওমী মাদরাসার আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ তালীম এবং তাযকিয়ার সমন্বয় করে সুন্নাতের তালীম এবং তা বাস্তবায়নের যে মিশন তা নিয়ে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) সব সময় ফিকির মন্দ ছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যয় করেছেন এর পেছনে। নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহে তিনি সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বার্ষিক ইসলাহী বয়ান ও ইজতেমার আয়োজন করতেন। প্রত্যেক বছর রবিউল আউয়াল মাসে প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুই দিনব্যাপী মারকাযে এহয়ায়ে সুন্নাত ইজতেমা করা তাঁর মামুল ছিল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ এতে যোগ দিয়ে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার মেহনতে অংশ নিয়ে থাকেন।

আলহামদু লিল্লাহ, হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর আজ অবধি এহয়ায়ে সুন্নাতের মহান কাজটি আল্লাহ তা'আলা চালু রেখেছেন। এতে অংশগ্রহণকারীগণও অতি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে শরীক হয়ে থাকেন।

এ বছরও এহয়ায়ে সুন্নাত ইজতেমাকে উপলক্ষ করে আয়োজন চলছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উলামায়ে কেরাম, ইমাম, খতীব এবং বিভিন্ন মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ তাশরীফ আনতে আরম্ভ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই ক্ষুদ্র মেহনত কবুল করুন। আগত সকল মেহমানের যাবতীয় খিদমাত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দান করুন। এহয়ায়ে সুন্নাতের হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর রেখে যাওয়া মিশন আরো বেগবান করুন। উম্মাহের মাঝে সুন্নাহ পরিপালন এবং সমাজে তা প্রতিষ্ঠার আন্তরিক জযবা দান করুন। রাসূল (সা.)-এর আন্তরিক মুহাব্বত ও ভালোবাসা ইতাআত ও ইত্তিবা সহকারে দান করুন পুরো উম্মাহের অন্তরে। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২২/১১/২০১৭ ইং

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (٩) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١)

তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক; সবাই তাঁর নিকট সমান।

তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাজত করে। আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর বিপদ চান তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।
(রা'আদ ৯,১০,১১)

عالم الغيب والشهادة : এখানে غيب শব্দ দ্বারা ওই বস্তু বোঝানো হয়েছে, যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত। অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না। এর বিপরীত شهادة হচ্ছে ওই সব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ যে তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

الكبير শব্দের অর্থ বড় এবং متعال এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলির ঊর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফের ও মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত। কিন্তু উপলব্ধি দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলি সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণত, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চ, ঊর্ধ্বে এবং পবিত্র। কোরআনে পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলি থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বারবার বলেছে سبحان الله عما يصفون অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ওই সব গুণাবলি থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

معقبات শব্দটি معقبة এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে তাকে معقبة অথবা متعقبة বলা হয়।

من بين يديه এর শাব্দিক অর্থ উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক।

من خلفه এর অর্থ পশ্চাদ্দিক। من امر الله এখানে من কারণবোধক অর্থ দেয়। অর্থাৎ بامر الله কোনো কোনো কেরাআতে এ শব্দটি بامر الله বর্ণিত আছে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী)

আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হেফাজত করা তাদের দায়িত্ব।

বোখারী শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের দুটি দল হেফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নিয়ে যান এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাযের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবু দাউদ শরীফের এক হাদীসে হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাজতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার ওপর যাতে কোনো প্রাচীর ধসে না পড়ে কিংবা সে কোনো গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোনো জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হেফাজত করেন। তবে কোনো মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হয়ে যায়, তখন হেফাজতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যান। (রূহুল মাআনী)

হযরত উসমান গনি (রা.)-এর রেওয়ায়াতে ইবনে জারীরের এক হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে হেফাজতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে হেফাজত করাই নয়, বরং তাঁরা মানুষকে পাপকাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহভীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন, যাতে সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এর পরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তাঁরা দু'আ ও চেষ্টা করেন, যাতে সে শীঘ্রই তাওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনোরূপেই হুঁশিয়ার না হয় তখন তাঁরা তার আমলনামায় গোনাহ লিখে দেন।

মোটকথা এই যে হেফাজতকারী ফেরেশতা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগ্রনে হেফাজত করেন। হযরত কা'আব আহবার বলেন, মানুষের ওপর থেকে আল্লাহর হেফাজতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে নিজেদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তাকদীরে ইলাহী মানুষের হেফাজতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ তা'আলাই কোনো বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

(তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন অবলম্বনে)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩৬

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–প্রথম অধ্যায় :

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

হাদীস নং-৭ :

ত. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, নামায দ্বীনের খুঁটি।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْفَقِيهُ، حدثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ عِنْدَ اللهِ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ " :الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/৩৯ হা. ২৮০৭, জামিউস সগীর হা. ১১৮৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

থ. এক হাদীসে আছে, ঘরে নামায পড়া নূরস্বরূপ। সুতরাং তোমরা (নফল) নামায পড়ে নিজেদের ঘরগুলোকে উজ্জ্বল করো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ :خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ لَهُمْ :مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا :مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ :فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا :نَعَمْ، قَالَ :فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ

(সুনানে ইবনে মাজাহ হা. ১৩৭৫, মুসনাদে আহমদ ১/১৪ হা. ৮৬, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১/২৫৭ হা. ৯৮৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/২৫৬ হা. ৬৫২১, আসসুনানুল কুবরা [বাহয়হাকী] ১/৩১২ হা. ১৫০০)

হাদীসটির মান : হাসান

দ. আর এই হাদীস তো খুবই প্রসিদ্ধ যে আমার উম্মত কিয়ামতের দিন ওজু ও সিজদার দরুন উজ্জ্বল হাত-পা এবং উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হবে এবং এই আমল দ্বারাই তাদেরকে অন্যান্য উম্মত হতে চেনা যাবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ -قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا :أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ :أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا :كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا :بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ": فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ :إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا

(বোখারী শরীফ হা. ১৩৬, মুসলিম শরীফ, ১/২১৮ হা. ২৪৯, সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৬ হা. ৬, সুনানে ইবনে মাজাহ হা. ৪৩০৬, মুসনাদে আহমদ ২/২১৮ হা. ৭৯৯৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

ধ. এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন আসমান হতে কোনো বালা-মুসিবত নাযিল হয় তখন মসজিদ আবাদকারীদের হতে তা সরিয়ে নেওয়া হয়।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللـه بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِذَا عَاهَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أُنْزِلَتْ صُرِفَتْ عَنْ عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/৮২ হা. ২৯৪৭, কানজুল উম্মাল হা. ১৮৯৪৫, আল কামেল [ইবনে আদী] ৩/২৩৪ হা. ৭৪৫)

হাদীসটির মান : হাসান

ন. বিভিন্ন হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা সিজদার নিশানাকে জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। সে তা জ্বালাতেই পারবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ

(বোখারী শরীফ হা. ৭৪৩৭, মুসলিম শরীফ হা. ১৮১, সুনানে ইবনে মাজাহ হা. ৪৩২৬, মুসনাদে আহমদ ২/২৯৩ হা. ৭৯২৭)

হাদীসটির মান : সহীহ

প. অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) একবার পেটের ওপর ভর করে শুয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পেটে কি ব্যথা হচ্ছে? হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আরজ করলেন–জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, ওঠো, নামায পড়ো। নামাযের মধ্যে শেফা রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ :حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَجِّرُ، قَالَ :فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ :اشكمت درد؟ ، قَالَ :قُلْتُ :لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ :صَلِّ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً، اشكمت درد يُعْنَى تَشْتَكِي بَطْنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ

وفي رواية :حَدَّثَنا أَبو بكر الطلحي، حَدَّثَنا محمد بن عبد اللـه الحضرمي، حَدَّثَنا جبارة بن المغلس، حَدَّثَنا ذؤاد بن علبة، عَن ليث، عَن مجاهد، عَن أَبي هُرَيرة قال :دخل على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم وأنا أتلوى من بطني في المسجد فقال :اشكمت درد؟ قلت :نعم فقال :قم فصل فإن في الصلاة شفاء

(সুনানে ইবনে মাজাহ ২/২৬৮৫ হা. ৩৪৫৮, মুসনাদে আহমদ ১৫/২৮ হা. ৯০৬৬, জামেউস সগীর ৩/১২৫৫, তিব্বে নববী [আবু নাঈম] ১/২৬৬ হা. ১৫৯)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ফ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা স্বপ্নযোগে বেহেশত দেখলেন। সেখানে তিনি হযরত বেলাল (রা.)-এর জুতা ঘষে চলার শব্দ শুনতে পেলেন। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত বেলাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সেই বিশেষ আমল কী, যার বদৌলতে জান্নাতেও তুমি আমার সাথে সাথে চলছিলে? তিনি আরজ করলেন, দিবা-রাত্রি যখনই আমার ওজু নষ্ট হয় তখনই ওজু করে নিই এবং যত রাক'আত তৌফিক হয় তাহিয়্যাতুল ওজুর নামায পড়ে নিই।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، -وَاللَّفْظُ لَهُ -حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ :عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ بِلَالٌ :مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً، مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا، فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ، مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

(বোখারী শরীফ হা. ১১৪৯, মুসলিম শরীফ হা. ২৪৫৮, নাসাঈ শরীফ ৫/৬৬ হা. ৮২৩৬, মুসনাদে আহমদ ২/৩৩৩ হা. ৮৪০৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

ব. হাদীস শরীফে আছে, কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে নেককার লোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হতে পারি? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–হ্যাঁ, যখন খারাবি অধিক হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ :نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

(বোখারী শরীফ ৭/৪৪৩ হা. ৩৩৪৬, মুসলিম শরীফ ৪/২২০৭ হা. ২৮৮০, নাসাঈ শরীফ ৬/৩৯১ হা. ১১৩১, তিরমিযী শরীফ ৪/৪১৬ হা. ২১৮০, ইবনে মাজাহ শরীফ ৪/৩৩০ হা. ৩৯৫৩, মুসনাদে আহমদ ৪৫/৪০৩ হা. ২৭৪১৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

প্রচলিত ভুলসমূহের সংশোধন জরুরি : কিছু গোনাহ আছে, যেগুলোকে আমরা গোনাহ বলেও মনে করি না। ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যাওয়ায় সেরূপ অনেক ভুল ও গোনাহের কাজ আমরা করে থাকি। যেমন–শরয়ী পর্দার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ছেলেদের কাপড় পুরো হাতা আর মেয়েদের কাপড় অর্ধ হাতা হয়। অথচ তা পূর্ণ হাতা হওয়া আবশ্যক। ছেলেদের টুপি মোটা কাপড়ের হয়; কিন্তু নারীদের ওড়না খুবই পাতলা হয়। যার কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। চুল দেখা যায়। এমতাবস্থায় তো নামাযও হবে না। এসব হলো প্রচলিত ভুল। এসব যে ভুল–এই অনুভূতিও আমাদের থাকে না। আচ্ছা, কেউ যদি ভুলবশত বিষ বা আফিম খেয়ে ফেলে তার কি প্রভাব পড়বে না? প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে। তাই আমাদের সমাজে যেসব ভুল প্রচলিত আছে, সেগুলো সংশোধনের ফিকির করতে হবে। যেকোনো কিছু ব্যবহার কারার সময় সে ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যদি ঠিক না হয় তা পরিহার করতে হবে এবং শুদ্ধটার ওপর আমল করতে হবে।

দরূদ শরীফের উপকার :
দরূদ শরীফ পাঠে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা প্রকাশে আল্লাহ তা'আলা খুবই খুশি হন। যেমন–রাসূল (সা.)-এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলার ১০টি রহমত বর্ষিত হয়। তাই সব সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা প্রয়োজন। দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস এভাবে গড়া যায়–দৈনিক কিছু কিছু দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকেন। বিশেষ করে প্রত্যেক নামাযের পর কমপক্ষে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করেন। ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। জুমু'আর দিনের দরূদ শরীফের আমলটি গুরুত্ব সহকারে পালন করেন। যখন মনে পড়ে তখন থেকেই শুরু করে দেন। যেমন–এখন থেকেই দরূদ শরীফের আমল গুরুত্ব সহকারে আরম্ভ করে দেন। ইনশা আল্লাহ অসংখ্য ফায়দা হবে।

মসজিদের আদবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
মসজিদে গমনের সময় এই কথা চিন্তায় রাখতে হবে যে আহকামুল হাকেমীনের দরবারে যাচ্ছি। আদব, সম্মান এবং স্থিতিশীল সহকারে যাওয়া। দৌড়ে না যাওয়া। দুনিয়াবী কথাবার্তা না করা। মসজিদের ফেরেশতাদের মতোই থাকা। দরূদ শরীফ, কালেমা এবং আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে করতে যাওয়া। মসজিদে প্রবেশের সময় ই'তিকাফের নিয়্যাত করা। আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারের যাবতীয় আদব ও সম্মান রক্ষা করা।

জাহেরী আমলের প্রভাব অন্তরে পতিত হয় :
মজলিসে স্থির হয়ে বসা। হাত-পা ঠিক করে বসা। এর উপকারের মধ্যে একটি হলো অন্তরে সুস্থতা আসবে। যখন অন্তর সুস্থ হবে, তখন সব আমল ঠিক হয়ে যাবে। কারণ অন্তর হলো দেহের রাজা। অন্তর ঠিক হলে তার অধীনস্থ দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ঠিক হয়ে যাবে। এ কারণেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামাযে কাতার সোজা করার। একেবারে বরাবর হওয়া। যদি কাতার ঠিক না হয় তবে এর প্রভাব অন্তরকে প্রভাবিত করবে। অন্তরের মধ্যে এক প্রকার দুষ্ক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

ভুল সংশোধনের ফিকির করা :
মানুষ মাত্রই ভুল করবে। ভুল-ত্রুটি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন ভুল সংশোধনের ফিকির। ভুল স্বীকার করা এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করা। এটিই মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন! তাঁর শান-মান কত বড় ছিল! কিন্তু তিনি সব সময় নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের ফিকির করতেন। তাঁর খানেকাহ থেকে 'আননুর' নামে যে পুস্তিকা প্রকশিত হতো তাতে 'তরজীহুর রাজেহ' নামে এই বিষয়গুলো স্থান পেত। তা থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা মিলত। ভুল হলে তা গোপন না করা। তার ওপর জিদ না করা। ভুল-ত্রুটি স্বীকার করা এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করা। যে স্তরের ভুল সেই স্তরের সংশোধনের পদ্ধতি আছে। তা জ্ঞাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া এবং সেই হিসেবে কাজ করা।

ইলমকে কার্যকর বানানোর পদ্ধতি :
যারা দ্বীনি খিদমতে লিপ্ত, দরস দানের যাদের সুযোগ হয়েছে তাদের উচিত এর কদর করা। কিন্তু এর ওপর অহমিকা ও গৌরব না করা। কারণ শুধু পড়া এবং পড়ানোতে কোনো ফায়দা নেই, যতক্ষণ তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয়। তাই শিক্ষকতার পাশাপাশি নিজের মধ্যে ইখলাস এবং লিল্লাহিয়্যাত সৃষ্টির চেষ্টা কোশেশ থাকা জরুরি। এসব পওয়া যায় আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শ থেকে। তাঁদের সাহচার্যের বরকতে ইখলাস এবং লিল্লাহিয়্যাত পয়দা হয়। তখন মানুষের কাজকর্ম ও আমল নাম কুড়ানোর জন্য থাকে না। বরং সব কিছু আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়। ইলমের মাধ্যমে রাস্তা সহজ হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছা যায় না। এর জন্য দু'আও বলে দেওয়া হয়েছে–

اللهم انى اسئلك حبك وحب من يحبك

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছ থকে আপনার মুহাববত এবং ওই সব লোকের মুহাব্বতের প্রার্থনা করি, যাঁরা আপনার সাথে মুহাব্বত রাখেন।

সুতরাং আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শে বসার গুরুত্ব দেওয়া এবং দু'আ করা। ইনশাআল্লাহ ইলমকে কার্যকর করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

মীলাদুন্নবী (সা.) পালনের সঠিক পদ্ধতি

কোরআন-সুন্নাহর পর্যালোচনায় দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা কিছু ইবাদতকে তারিখের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন আর কিছু ইবাদতকে জুড়ে দিয়েছেন দিনের সঙ্গে। তারিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে দিন কোনটি হচ্ছে, তা দেখার বিষয় নয়। নির্দিষ্ট তারিখেই সেই ইবাদত পালিত হবে, যেকোনো দিনে তা হতে পারে। যেমন হজের নির্ধারিত তারিখ হচ্ছে ৯ জিলহজ। সর্বদা ওই তারিখেই হজ পালিত হবে, তবে বার হিসেবে যেকোনো দিন হতে পারে। তদ্রূপ রোজার সম্পর্কও তারিখের সঙ্গে। রমাজানের প্রথম তারিখ থেকে রোজা শুরু হবে। এতে দিনের হিসাব ঠিক থাকবে না। সপ্তাহের যেকোনো দিন রমাজানের প্রথম তারিখ হতে পারে। ঠিক প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের নফল রোজার ব্যাপারটিও। তারিখের সঙ্গে এসব ইবাদত সম্পৃক্ত, দিনের সঙ্গে নয়।

পক্ষান্তরে কিছু ইবাদত রয়েছে দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে তারিখ কোনটি, তা দেখার বিষয় নয়। নির্দিষ্ট দিনেই তা পালন করতে হবে, তারিখ যা-ই হোক না কেন। যেমন শুক্রবারের বিভিন্ন আমল। যার মধ্যে রয়েছে ফজরের নামাজের প্রথম রাক'আতে সূরায়ে আলিফ লা-ম মী-ম সিজদার ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে দাহর-এর তিলাওয়াত। উত্তমরূপে গোসল করে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, সূরা কাহাফের তিলাওয়াত, আসর নামাজের পর স্থান ত্যাগের আগে ৮০ বার বিশেষ দরূদ শরিফ পাঠ করা এবং সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ মুনাজাত করা ইত্যাদি। এগুলো শুক্রবার দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইবাদত। তারিখের সেখানে কোনো ধর্তব্য নেই। মাসের যেকোনো তারিখ হতে পারে। কোনো মাসে চারটি শুক্রবার হবে, আবার কোনো মাসে পাঁচটি।

দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে সোমবারের রোজা। প্রতি সপ্তাহের এই দিনে নফল রোজা রাখার অনেক ফজিলত রয়েছে। দিন হিসেবে এটা পরিপালিত হয়ে থাকে, তারিখ দেখে নয়। হাদীস শরীফে এসেছে,

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনে আমাকে নবুয়াত দান করা হয়েছে।' (মুসলিম : ১১৬২)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত বিশুদ্ধ এই হাদীস দ্বারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্মদিনে উম্মতের করণীয় কী, তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অন্য হাদীসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়ে থাকে। অতএব রোজা অবস্থায় আমার আমলনামা পেশ করা হোক, এটা আমি পছন্দ করি। (তিরমিজি : ৭৪৭)

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মের কারণে বছরের প্রতিটি সোমবার অতি মূল্যবান হয়ে গেছে। তাই এই দিনে নফল রোজার বিধান রাখা হয়েছে। এই দিনে রোজা রাখা প্রকৃত নবীপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য হবে।

সোমবার নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মদিন, এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ১২ রবিউল আউয়াল তাঁর পবিত্র জন্মদিন হওয়ার কথা কোরআনেও নেই, হাদীসেও নেই। ঐতিহাসিকরাও ১২ তারিখে জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে সোমবারই হচ্ছে তাঁর পবিত্র জন্মদিন, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে তারিখ দেখার বিষয় নয়, ১২ তারিখও হতে পারে, ভিন্ন তারিখও হতে পারে।

প্রকৃত নবীপ্রেমিক হতে হলে প্রতি সোমবার রোজা রাখা চাই। সঙ্গে বৃহস্পতিবারও রাখা উচিত। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত। এর বিপরীত দিনের প্রতি লক্ষ না করে তারিখের ভিত্তিতে ১২ তারিখকে জন্মদিন ধরে নিয়ে জশনে-জুলুস বা মিছিল বের করা একটি মনগড়া কাজ বৈ কিছু নয়। ইসলামের সঙ্গে এসব জশনে-জুলুসের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা ইসলামের স্বর্ণযুগে এমন মিছিলের বা জন্মদিন পালনের প্রথা খুঁজে পাওয়া যায় না। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে জশনে-জুলুস বা জন্মদিন পালনের নিয়ম ছিল না। পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও পালিত হয়নি। সাহাবাদের যুগেও কেউ পালন করেননি। চার ইমামসহ মুহাদ্দিসীনের কেউ তা পালন করেননি। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি (রহ.), খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমীরি (রহ.), শাহজালাল ইয়ামেনি (রহ.)-এর মতো বুযুর্গদের কেউ তা পালন করেননি।

তাই আসুন, প্রকৃত নবীপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ করতে আমরা প্রতি সোমবার নফল রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলি। রোজা অবস্থায় আল্লাহর দরবারে আমাদের আমলনামা পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। যদি সময়-সুযোগের অভাবে বা অন্য কোনো কারণে সারা বছর এ রোজা পালনের তাওফিক না হয়, তবে কমপক্ষে রবিউল আউয়াল মাসে এ ইবাদতটি আমরা পালন করতে পারি। হয়তো চারটি রোজা রাখা লাগবে। এতে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ বাস্তবায়িত হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।' (সূরা আল আহযাব : ২১)

অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ মোতাবেক প্রতিটি ইবাদত পালন একজন নবীপ্রেমিক বান্দার একান্ত কাম্য হওয়া উচিত।

গ্রন্থনা : মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাযির-নাযির কি না?

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

মানবজাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকেই চলে আসছে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। বাতিলের অবসান ঘটিয়ে হক প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেছেন অসংখ্য নবী-রাসূল, উলামা-মাশায়েখ ও সংগ্রামী মহাপুরুষ। করেছেন আমরণ সংগ্রাম।

বর্তমানেও বাতিলের সয়লাবে আচ্ছাদিত হয়ে আছে আমাদের দেশ ও সমাজ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শ বছর পূর্বে বিশ্বমানবতার মুক্তির কাণ্ডারি, নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র যবান থেকে নিসৃত হয়েছে অমীয় বাণী, 'আমার উম্মত এমন এক যমানার সম্মুখীন হবে, যখন ঈমান নিয়ে টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার ন্যায় কষ্টকর হবে।' (জামে' তিরমিযী; হাদীস ২২৬০, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৯০৭৩)

সেই চিরন্তন বাণীর জ্বলন্ত বাস্তবায়ন আজ মুসলিম উম্মাহ ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছে। জাতীয়-বিজাতীয়, দেশীয়-বিদেশীয়, চতুর্মুখী হায়েনার আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম উম্মাহর স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করার স্থানটুকুও নেই। নেই ঈমান-আকীদা নিয়ে বেঁচে থাকার মতো সুন্দর ও নিরাপদ কোনো পরিবেশ। চারদিকে চলছে ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা ও বাড়াবাড়ি। যার ফলে আজ দ্বীনের নামে বদ-দ্বীন এবং শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারে ছেয়ে গেছে সমাজ।

এমনি এক বহুল প্রচলিত বিদ'আত ও কুসংস্কার হলো, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করা। এর ভ্রান্তি সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

হাযির ও নাযির (حاضر و ناظر) শব্দ দুটি আরবী শব্দ। হাযির অর্থ সর্বাবস্থায়, সর্বস্থানে উপস্থিত বা বিদ্যমান। আর নাযির অর্থ সর্বদ্রষ্টা। যখন এ দুটি শব্দকে একত্রে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়, তখন এর দ্বারা ওই সত্তাকে বোঝানো হয়, যার অস্তিত্ব বিশেষ কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর অস্তিত্ব একই সময়ে গোটা দুনিয়াকে বেষ্টন করে রাখে এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের অবস্থা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সামনে থাকে।

হাযির-নাযির সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকলেই একমত যে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে হাযির-নাযির কথাটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য। হাযির-নাযির হওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সিফাত। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ এসব গুণের অধিকারী হতে পারে না। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা কোনো পীর-বুযুর্গ, ওলী-দরবেশও হাযির-নাযির হতে পারেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা কোনো পীর-বুযুর্গ, ওলী-দরবেশকে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করা কুফর ও শিরকের শামিল এবং ইসলামী আকীদার পরিপন্থী।

হাযির-নাযির সম্পর্কে বিদ'আতীদের আকীদা ও তার পর্যালোচনা

তাদের আকীদা হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাযির-নাযির বা সর্বত্র বিরাজমান। এই বিশ্বাসের কারণে তারা মীলাদের মধ্যে 'কিয়াম' করে থাকে। তারা মনে করে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে দরূদ পাঠ করা হলে তিনি তা জানেন এবং দেখেন। কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাই তাঁর উপস্থিতিতে 'কিয়াম' করতে হবে। তাদের আকীদা মতে শুধু নবীই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নন; বরং সকল বুযুর্গানে দ্বীনও হাযির-নাযির, সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁরাও পৃথিবীর সব কিছুকে হাতের তালুর মতো দেখতে পান। তাঁরা দূরের ও কাছের আওয়াজ শুনতে পান। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারেন এবং হাজার হাজার মাইল দূরের হাজতমন্দ ব্যক্তির হাজত পূরণ করতে পারেন। নাউযুবিল্লাহ!

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাযির-নাযির এ দাবি দ্বারা তারা যদি তাঁর সর্বত্র শারীরিকভাবে বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে তা অযৌক্তিক এবং সুস্পষ্ট গোমরাহী হবে। কারণ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রওজা মুবারকে আরাম করছেন। সমস্ত আশেকীনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে গিয়ে হাযিরা দেন। তাঁর রওজা মুবারক যিয়ারত করেন।

আর যদি তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বত্র 'হাযির-নাযির'–এ দাবি দ্বারা তাঁর 'রূহানী হাযিরী' উদ্দেশ্য নেয়, অর্থাৎ এটা বোঝায় যে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র রূহের জন্য সর্বস্থানে বিচরণ করার অনুমতি রয়েছে, তাহলে বলব, যদি মেনেও নেওয়া হয় যে তাঁর জন্য রূহানীভাবে সর্বস্থানে হাযির হওয়ার অনুমতি রয়েছে, তবু এ অনুমতির দ্বারাই তাঁর সর্বস্থানে উপস্থিত হওয়া প্রমাণিত হয় না। সর্বস্থানে বিচরণের অনুমতি থাকা আর বাস্তবেই সর্বস্থানে উপস্থিত হওয়া এক কথা নয়।

তবে আসল কথা হলো, নবীজি

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বত্র রূহানী উপস্থিতির বিষয়টি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো, তিনি গায়েব জানেন। অথচ কোরআন-হাদীসের অসংখ্য দলিল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে তিনি জীবদ্দশাতেও গায়েব জানতেন না। আর মৃত্যুর পরও তিনি ততটুকুই জানেন, যতটুকু তাঁকে জানানো হয়। সুতরাং রূহানীভাবে হাযির-নাযির হওয়ার বিশ্বাসটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এখন যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রূহানী উপস্থিতির দাবি করে, তাহলে সেটা হবে একটা স্বতন্ত্র দাবি। এর সপক্ষে দলিল থাকা জরুরি। অথচ এর সপক্ষে কোনো দলিল নেই। সুতরাং দলিলবিহীন এমন আকীদা পোষণ করা নাজায়েয হবে। এ বিষয়ে তাদের দাবির পক্ষে যেসব দলিল পেশ করে থাকে সেগুলো দ্বারা কোনোভাবেই হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাযির-নাযির' হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

বিদ'আতীদের দলিল ও তার খণ্ডন

প্রথম দলিল : তাদের দাবির পক্ষে সবচেয়ে জোরালোভাবে যে দলিল পেশ করা হয় তা হলো, সূরা আহযাবের দুটি আয়াত যেখানে নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কয়েকটি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, 'হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি শাহিদ (সাক্ষ্যদাতা), সুসংবাদ প্রদানকারী ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে।' (সূরা আহযাব; আয়াত ৪৫-৪৬)

এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'শাহিদ' (شاهد) বলা হয়েছে। 'শাহিদ' শব্দের অর্থ 'সাক্ষ্যদাতা'ও হতে পারে আবার 'হাযির-নাযির'ও হতে পারে। সাক্ষ্যদাতাকে 'শাহিদ' এ জন্য বলা হয় যে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সাক্ষ্য দেয়। বিদ'আতীদের দাবি অনুযায়ী, এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'শাহিদ' এ কারণে বলা হয়েছে যে তিনি অদৃশ্যের বিষয় দেখে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন। অন্যথায় অন্যান্য নবীও তো সাক্ষ্য প্রদান করে থাকেন। তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও অন্যান্য নবীর মাঝে পার্থক্য থাকল কোথায়?

অথবা এ কারণে 'শাহিদ' বলা হয়েছে যে তিনি কিয়ামতের দিন সকল নবীর পক্ষে চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর দেখা ছাড়া এমন সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব নয়। আর এটাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাযির-নাযির হওয়ার প্রমাণ।

অনুরূপভাবে বিদ'আতীদের দাবি অনুযায়ী হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুবাশ্শির (সুসংবাদদাতা), নাযির (সতর্ককারী) এবং দাঈ ইলাল্লাহ (মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) হওয়াও তাঁর হাযির-নাযির হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা এসব কাজ অন্যান্য নবীও করেছেন। তবে তাঁরা করেছেন শুনে শুনে আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছেন দেখে দেখে।

অনুরূপ এ আয়াতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'সিরাজ' ও 'মুনীর' (তথা আলো বিস্তারকারী প্রদীপ) বলা হয়েছে। যার অর্থ সূর্য। এটা পৃথিবীর সর্বস্থানে বিদ্যমান, প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যমান। তদ্রূপ নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও সর্বস্থানে বিদ্যমান। সুতরাং এই আয়াতের প্রত্যেকটি শব্দ থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'হাযির-নাযির' হওয়া প্রমাণিত হয়।

জবাব : বিদ'আতী ভাইয়েরা এ সত্যটুকুও অনুধাবন করতে পারেননি যে সূর্য সর্বস্থানে বিদ্যমান নয়; বরং যেখানে দিন সূর্য শুধু সেখানেই বিদ্যমান থাকে। আর যেখানে রাত সেখানে সূর্য অবিদ্যমান। সুতরাং এই উপমার মাধ্যমে বিদ'আতীদের দাবি প্রমাণিত হয় না; বরং এর বিপরীতে তাদের বক্তব্য দ্বারাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বত্র হাযির-নাযির না হওয়া প্রমাণিত হয়।

আর নবীগণ গায়েব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন, এর দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সব কিছু জানা ও দেখা প্রমাণিত হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ওহী ও ইলমের মাধ্যমে যতটুকু জানেন তাঁরা শুধু ততটুকুরই সংবাদ প্রদান করে থাকেন।

অনুরূপভাবে বিদ'আতীরা 'শাহিদ' শব্দের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা করেছেন তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও প্রবৃত্তি নির্ভর বৈ কিছুই না। কারণ 'শাহিদ' শব্দটি ইসমে ফায়েলের সীগা। যার অর্থ নিশ্চিত ও সঠিক সংবাদ প্রচার করা। এর জন্য সাক্ষ্যদাতাকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি নয়। কারণ অন্যের মাধ্যমে কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে জেনে সাক্ষ্য দিলেও তার সংবাদদাতাকে 'শাহিদ' বলা হবে।

বিদ'আতীদের দ্বিতীয় দলিল :

তারা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাযির-নাযির হওয়ার পক্ষে সেসব হাদীস পেশ করে, যেসব হাদীসে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ইরশাদ করেছেন। যেমন এক হাদীসে আছে, 'আমি তোমাদের ঘরে বৃষ্টির ন্যায় ফেতনা পড়তে দেখছি।' এ ছাড়া জান্নাত-জাহান্নাম, হাউজে কাউসার, বরযখ ইত্যাদির খবর প্রদানসম্বলিত হাদীস দ্বারাও তাঁর হাযির-নাযির হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করে থাকে।

জবাব : এ ব্যাপারে শেখ সাদী (রহ.) সুন্দর বলেছেন, 'কেউ হযরত ইয়াকুব (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, ব্যাপার কী? আপনি মিসর থেকে শত সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামার ঘ্রাণ পেলেন। অথচ কেনানের অনতিদূরের এক কূপে তাঁর ভাইয়েরা যখন তাঁকে নিক্ষেপ করল আপনি তা দেখতে পেলেন না? উত্তরে তিনি বললেন, আমাদের অবস্থা হলো আকাশে চমকানো বিদ্যুতের ন্যায়। যা চমকে উঠেই হারিয়ে যায় (অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানির ফয়যান হয়, তখন আমরা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দেখতে পাই। তবে এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না, অল্পক্ষণ পরেই শেষ হয়ে যায়।) কখনো আমরা উঁচু আসনে বসি, আবার কখনো নিজের পায়ের পিঠ পর্যন্ত দেখতে পাই না?। (গুলিস্তাঁ ২/৭৩)

নবীজির ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়টিও এমন। কথাগুলো তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেননি বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন এবং উম্মতকে জানানোর জন্য আদেশ করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যে নবীগণ হাযির-নাযির নন; বরং তাঁদেরকে যতটুক জানানো হয়, তাঁরা শুধু ততটুকুই জেনে থাকেন।

এ ছাড়া বিদ'আতীরা আরো কিছু আয়াত ও হাদীস দ্বারা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাযির-নাযির হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করে থাকেন, যেখানে তারা কোরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা ও প্রবৃত্তির শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এর কোনোটির দ্বারাই তাঁর 'হাযির-নাযির' হওয়া প্রমাণিত হয় না।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দলিল

প্রথম দলিল : আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন, 'আপনি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মুসার কাছে হুকুম প্রেরণ করেছি। আপনি তা প্রত্যক্ষও করেননি।' (সূরা কাসাস; আয়াত ৪৪)

পাঠক! একটু চিন্তা করুন, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের আয়াত নাযিল করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনা শুনিয়ে বলছেন, আপনি তূর পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে হাযিরও ছিলেন না, নাযিরও ছিলেন না, অর্থাৎ ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না এবং ঘটনা প্রত্যক্ষও করেননি। তাই কোরআনের আয়াত নাযিল করে আমি আপনাকে সেই ঘটনা শোনাচ্ছি। কিন্তু আমার বিদ'আতী ভাইয়েরা আজ বলতে চাচ্ছেন যে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তা প্রত্যক্ষ করেছেন। কোরআন-হাদীস সম্পর্কে কী পরিমাণ অজ্ঞ হলে মানুষ এমন কথা বলতে পারে?

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় আপনি (তূর পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে) হাযিরও ছিলেন না, নাযিরও ছিলেন না। রাসূল্লাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাযির-নাযির বলা হলে আল্লাহ তা'আলার কথা নিরর্থক প্রমাণিত হয়। নাউযুবিল্লাহ।

দ্বিতীয় দলিল : অপর স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আপনার আশপাশের পল্লীবাসী ও মদীনাবাসীর মাঝে এমন কিছু মুনাফিক রয়েছে, যারা মুনাফিকীতে সিদ্ধ। আপনি তাদের সম্পর্কে জানেন না, আমি জানি।' (সূরা তাওবা; আয়াত ১০১)

তৃতীয় দলিল : আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর ভাইদের ঘটনা বিস্তারিত জানানোর পর ইরশাদ করেন, '(হে নবী!) এ কাহিনী অদৃশ্য সংবাদসমূহের একটি, যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি, আর আপনি সেই সময় তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না যখন তারা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছিল (যে তারা ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দেবে)।' (সূরা ইউসুফ; আয়াত ১০২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উদ্দেশ করে বলেন, হে নবী! হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দশ ভাই মিলে যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কূপে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র করছিল তখন আপনি সেখানে হাযির ছিলেন না এবং এ ঘটনার নাযিরও ছিলেন না, তাই ওহী নাযিল করে আপনাকে আমি তাঁর কাহিনী অবগত করছি।

চতুর্থ দলিল : হযরত মারয়াম এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা নবীজিকে অবগত করার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, '(হে নবী!) এসব অদৃশ্যের সংবাদ, যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে দিচ্ছি। তখন আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন মারয়ামের তত্ত্বাবধান কে করবে–(এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য) তারা নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল এবং তখনও আপনি তাদের কাছে (হাযির) ছিলেন না, যখন তারা (এ বিষয়ে) একে অন্যের সাথে বাদানুবাদ করছিল। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৪৪)

পঞ্চম দলিল : অনুরূপভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই তাঁর হাযির-নাযির হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে পৃথিবীতে বিচরণকারী কিছু ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়েছে, যারা (পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে) আমার উম্মতের প্রেরিত সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়। (সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১২৮২, মুস্তাদরাকে হাকেম; হাদীস ৩৫৭৬)

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি হাযির-নাযিরই হন, তাহলে ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সালাম পৌঁছানোর প্রয়োজনটা কী? এ ধরনের অসংখ্য প্রমাণ হাদীসের কিতাবের পাতায় পাতায় বিদ্যমান, যার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি হাযির-নাযির নন।

কোরআনের এ সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'হাযির-নাযির' নন বরং আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে যতটুকু অবগত করেন, তিনি ততটুকুই জানেন, এর বেশি কিছুই তিনি জানেন না। তাঁকে হাযির-নাযির বিশ্বাস করা শিরকী আকীদা, যার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

কাজেই বর্তমানে যারা জেনে না জেনে নবীজিকে হাযির-নাযির মনে করে শিরকী আকীদা পোষণ করছে, তাদের জন্য আবশ্যক হলো এই শিরকী আকীদা থেকে তাওবা করা। সাধারণ মুসলমানদেরও করণীয় হলো, হক্কানি উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রেখে এজাতীয় শিরিক-বিদ'আত থেকে নিজেদের ঈমান-আকীদাকে রক্ষা করা।

আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা

আল্লামা ড. শায়খ নূরুদ্দীন (সাবেক প্রভাষক : জামিয়াতু দামাস্ক)
ভাষান্তর : মুফতী আতীকুল্লাহ

'মহাব্বত' শব্দের অর্থ :

الحب (আল হুব্বু) المحبة (আল মহাব্বতু) আরবী শব্দ দু'টি এমন অর্থ প্রকাশ করে, যার সম্পর্ক কলবের সাথে। যা অন্য গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যাবলির বিপরীতে ব্যাপক অর্থবহ এবং ব্যাপক ক্রিয়াশীল। কেননা, তাতে 'মাহবুব' প্রেমিকের প্রতি হৃদয়ের টান ও আকর্ষণ পাওয়া যায়। তা মানুষের হৃদয়াঙ্গনে এমন বোধ ও চেতনা এবং জোশ-জযবা সৃষ্টি করে যে, প্রেমিক নিজের প্রিয় ব্যক্তির সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, এমনকি মাশুকের মহাব্বতে নিজের আত্মপরিচয়ও ভুলে যায়; নিজে নিজের বেগানা হয়ে যায় এবং নিজের রুচি-অভিরুচি ছেড়ে, নিজের স্বকীয়তা ও গুণাবলি ছেড়ে প্রিয় ব্যক্তির রুচি ও চিন্তা-চেতনাকে গ্রহণ করে নিতে কোনো রকম দ্বিধাবোধ করে না।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা যিনি মহাবিশ্বের মহান পালনকর্তা ও সব কিছুর স্রষ্টা তিনিই একমাত্র সব ধরনের সর্বোচ্চ ইশক ও মহাব্বত এবং প্রেম ও ভালোবাসার সর্বাধিক যোগ্য। কেননা একমাত্র তাঁরই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বোচ্চ গুণাবলি, যার না আছে শেষ, না আছে কোনো সীমারেখা। যার না আছে সংখ্যা, না তা গণনা করা যায়। তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিজের উদারতা ও বদান্যতার অসীম ধনভাণ্ডার থেকে অসংখ্য নায-নিয়ামত দান করেন, যার গণনা অসম্ভব এবং এত বেশি ইহসান করেন, যা কোনো কিছু দিয়ে বেষ্টন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা কোরআনে ইরশাদ করেন :

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا

'আর তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত গণনা করো তবে গুনে শেষ করতে পারবে না।' (সূরা ইব্রাহীম, ৩৬)

সৃষ্টিজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আমাদের নবী মুহাম্মদই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন ইশক-মহাব্বত ও প্রেম-ভালোবাসার সর্বাধিক যোগ্য, এমনকি নিজের জানের চেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ(الأحزاب ٦)

'ঈমানদারদের জন্য নবী তাঁদের জীবনের চেয়েও প্রিয়। তাঁর স্ত্রীগণ নিজেদের মা সমতুল্য।' (সূরা আহযাব : ৬)

উপরোক্ত আয়াত কোনো ধরনের শর্তছাড়া প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জাত ও সত্তাকে প্রত্যেক মুসলমানের আপন সত্তার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আয়াতটি প্রত্যেক জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে আনন্দিত হওয়া উচিত।

এমন গুণের সমাহার, যা মহাব্বতকে অবধারিত করে :

যে ব্যক্তির কাছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আসল পরিচয়-পরিচিতি অর্জন হয়ে যাবে, সে শুধু এ বাস্তবতাটাই জানবে তা নয় বরং হৃদয়ের গভীর থেকে সে অনুভব করবে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি প্রেম-ভলোবাসা ও ইশক ও মহাব্বতকে অবধারিত করে তুলতে যত গুণাবলি রয়েছে তা পূর্ণাঙ্গরূপে শুধুমাত্র তাঁর মধ্যেই রয়েছে, অন্য সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেসব ছিফাতে কামালিয়া তথা সর্বাঙ্গসুন্দর গুণাবলিকে আহলে ইলম ও আহলে ইরফান এবং আশেকে রাসূল (সা.)গণ সংক্ষিপ্ত আকারে দুটি বড় অংশে বিভক্ত করেছেন। যথা–

১. সেসব কামেল গুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল।

২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'জওদ ও সাখাওয়াত' উদারতা ও দানশীলতা।

ছিফাতে কামালিয়া (সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি) সাধারণত যা দ্বারা এক মানব অন্য মানবের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়।

উদাহরণস্বরূপ–একজন অন্যজনকে তার সুশোভন সুশ্রী চেহারা ও সুন্দর অবয়বের কারণে মহাব্বত করে কিংবা সুকণ্ঠস্বরের ও সুমিষ্ট আওয়াজের জন্য তার প্রতি আসক্ত হয় কিংবা অন্য যেকোনো সুষম-সুন্দর গুণাবলির কারণে, যা ইশক ও মহাববতকে সুনিশ্চিত করে তোলে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুডৌল চেহারা মোবারকের সৌন্দর্য ও সুগঠিত শরীর মোবারকের সুষমা ও লাবণ্য সকল সৃষ্টি থেকে উৎকৃষ্ট ও উত্তম ছিল যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাওয়াতুরের সাথে বর্ণিত এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا

বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সকল মানব চেহারা থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা মোবারক বেশি সুশ্রী এবং সবার থেকে তাঁর শারীরিক গঠন বেশি সুন্দর ছিল।'

(বোখারী শরীফ, হা. ৩৫৪৯ মুসলিম শরীফ, হা. ৬২১২)

"كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

হযরত হিন্দা ইবনে আবু হালা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ জাত ও ছেফাত এবং সত্তা ও গুণাবলির দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি সুসমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ ছিলেন। তাঁর চেহারা মোবারক

ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল, দ্বীপান্বিত ও নূরান্বিত।'
(সুনানে বায়হাকী : হা. ১৪৩০)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِى فِى وَجْهِهِ ،

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতো সুশ্রী, সুশোভিত ও সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা মোবারকে যেন সূর্য তার দ্যুতি ছড়াত।' (তিরমিযী শরীফ, হা. ৩৬৪৮)

عن أنس رضى الله عنه قال : ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبى صلى الله عليه و سلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبى صلى الله عليه و سلم

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি পাতলা কিংবা রেশমি কাপড়কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তুলতুলে, সুমসৃণ হাতের চেয়ে বেশি নরম পাইনি। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর (শরীরের/ঘামের) সুঘ্রাণ ও সুগন্ধির চেয়ে বেশি সুগন্ধি কখনো কোথাও পাইনি।' (বাখারী শরীফ, হা. ৩৩৬৮)

যাঁরাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সকলে এক বাক্যে বলেছেন :

لم أر قبله ولا بعده مثله -صلى الله عليه وسلم

'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতো না তাঁর পূর্বে কাউকে দেখেছি; না তাঁর পরে কাউকে।'

অতএব, আপনি মানবসৃষ্টির সৌন্দর্যের প্রতি যত বেশি আকৃষ্ট ও আসক্ত হোন না কেন, আপনাকে সকল সৃষ্টি থেকে এমনকি নিজের প্রিয় জীবন থেকেও বেশি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেই মহাব্বত করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের স্বর্ণশিখরে সমাসীন।

অনুরূপ বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি কোনো মানুষকে ভালোবাসবে তার উন্নত চরিত্র ও উত্তম আচার-আচরণ দেখে, যদিও তা থেকে সে বহু দূর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃথিবীর বুকে আখলাক ও সীরাত এবং সুচরিত্র ও আদর্শে সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ। যার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"অবশ্যই আপনি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" (সূরা কলম : ৪)

উপরোক্ত আয়াতে একটু ফিকির করলে বুঝতে পারবেন, যত ভালো গুণ ও উত্তম চরিত্র এবং সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেসবের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। عَـلَـى শব্দটি উচ্চতা বোঝায়। সুতরাং যত উন্নত আখলাক হতে পারে, যত উন্নত স্বভাব-চরিত্র হতে পারে এবং যত ইনসানী কামালাত মানবিক পূর্ণাঙ্গতা, সমৃদ্ধি ও শান-শওকাত হতে পারে, তিনি সেসবের সর্বোচ্চ মাকামে ও স্বর্ণশিখরে উপনীত। বাদ রইলো বেশি দানশীলতা ও অত্যধিক মঙ্গল সাধনার কারণে কাউকে মহাব্বত করা। মানবজাতি দুনিয়াতে সে ব্যক্তিকে ভালোবাসে, যে তার ওপর দু-একবার ইহসান করেছে আর সে ইহসান ও উপকার যত বেশি মূল্যবান ও বড় হোক না কেন, তা একদিন না একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ কাউকে এমন মুসিবত থেকে বাঁচাল যাতে তার ধ্বংস সুনিশ্চিত ছিল কিংবা তার কোনো ক্ষতি হয়ে যেত। যেটাই হোক না কেন, পরিশেষে তা খতম হয়ে যেত এবং যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

জাগতিক ইহসান ও উপকার কি কখনো বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দান ও অনুদানসমূহের সাথে তুল্য হতে পারে। যিনি সকল চারিত্রিক সৌন্দর্যের ছিলেন মিলনমোহনা। যাঁকে আল্লাহ তা'আলা সকল সর্বোৎকৃষ্ট আখলাক-চরিত্র দ্বারা এবং সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গসুন্দর গুণাবলি দ্বারা ভূষিত ও সুশোভিত করছেন। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুফর-শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের আলোয় আলোকিত করেছেন। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমান-ইয়াকিন ও মা'রেফাতের সুস্নিগ্ধ জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছেন।

খুব চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন যেন ভালোভাবে বুঝে আসে যে রাসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার-আমার জান্নাতের নিয়ামতে চিরস্থায়ী থাকার একমাত্র মাধ্যম। আপনি নিজেই বলুন তো, এই আযীমুশ শান ইহসান ও মহামূল্যবান আনুদানের চেয়ে বড় কোনো ইহসান হতে পারে কি?

এই ইহসানের শোকর ও বদলা এবং হক ও দাবি কিভাবে আদায় করবেন? যেহেতু আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে জাগতিক-ইহজাগতিক নিয়ামতসমূহ দান করেছেন এবং নিজের জাহেরী ও বাতেনী এবং প্রকাশ্য ও উহ্য নিয়ামতসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তাই একমাত্র রাসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের আপনাদের কামেল, মুকাম্মাল ইশক ও মহাব্বত এবং সবটুকু ও পূর্ণ প্রেম-ভালোবাসার সর্বাধিক যোগ্য, যা প্রত্যেকের জীবন, পরিবার-পরিজন এবং সকল সৃষ্টির মহাব্বত থেকে বেশি হবে। এমনকি আহলে মারেফাতের কেউ কেউ বলেছেন, 'যদি দেহের প্রতিটি লোম থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইশক ও মহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ হয় এবং শরীরের প্রতি শিরা-উপশিরা থেকে প্রেম-ভালোবাসার আওয়াজ আসে তবু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহাব্বতের যে হক রয়েছে তার সামান্যটুকু আদায় হবে। কেননা আল্লাহ ও স্বীয় রাসূলের মহাব্বত ও প্রেম-প্রীতিকে সকল

জিনিসের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

'ঈমানদারদের জন্য নবী তাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়। তাঁর স্ত্রীগণ নিজেদের মা সমতুল্য।' (আহযাব : ৬)

অন্য এক সূরাতে ইরশাদ করেন :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ :التوبة ٢٤

"তুমি বলে দাও, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোত্র, এমন ধন-সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ–এমন ব্যবসা, যাতে তোমরা মন্দায় পড়ার আশঙ্কা কর এবং এমন ঘরবাড়ি যা তোমরা পছন্দ করো যদি (এসব) তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ আদেশ অবাধ্য সম্প্রদায়কে (কল্যাণের পথ) দেখান না।" (সূরা তাওবা : ২৪)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা মহাব্বতের সকল প্রকার একত্র করে দিয়েছেন এবং ফরয করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাহ ও স্বীয় রাসূলের মহাব্বত প্রতিটি জিনিসের চেয়ে বেশি হতে হবে। এমনকি ওই সকল বস্তুসমষ্টির মহাব্বতসমূহ থেকে আল্লাহ ও স্বীয় রাসূলের মহাব্বত বেশি হতে হবে।

এ বিষয়টি আরো সুপ্রমাণিত করার জন্য রয়েছে বিশুদ্ধ বহু হাদীস। বোখারী-মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَلَدِهِ وَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট স্বীয় পিতা, ছেলেসন্তান এবং সকল লোক থেকে বেশি প্রিয় না হব।' (বোখারী শরীফ, হা. ১৫, মুসলিম শরীফ, ১৭৮)

উপরিউক্ত হাদীসটিতে সব ধরনের মহাব্বত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে স্বীয় জীবনের মহাব্বতও রয়েছে।

ইমাম বোখারী (রহ.)সহ অন্য ইমামগণ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে অন্য একটি রেওয়ায়াত নকল করেন, যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

'সেই সত্তার শপথ, যে সত্তার কুদরতী হাতে আমার জান রয়েছে! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছে স্বীয় পিতা ও ছেলেসন্তানের চেয়েও আমি বেশি মাহবুব না হই।'

উপরোল্লিখিত হাদীস শরীফে পিতা ও ছেলেসন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ, পিতা-মাতা ও ছেলেসন্তান অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় মানুষের কাছে খুব বেশি প্রিয়। আর তাদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পায় এবং মেহনত-মোজাহাদা ও পরিশ্রম করে। অনেক সময় দেখা যায়, অন্যান্য মহাব্বতের রিশতা ছেড়ে তাদেরকে নিয়েই থাকে। সুতরাং রেওয়ায়াতটি দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ঈমানদার ব্যক্তির ফরয ও অবশ্য কর্তব্য হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাব্বতকে সকল প্রকারের মহাব্বত এবং প্রত্যেক প্রিয় বস্তুর মহাব্বত, এমনকি স্বীয় জীবনের মহাব্বতের ওপরও প্রাধান্য দিতে হবে।

অনেক প্রকারের মহাব্বত রয়েছে, তন্মধ্যে থেকে কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রকার নিম্নবর্ণিত হলো। যথা–

১. শাফকাত ও রহমতের মহাব্বত। এটি হলো পিতার স্বীয় সন্তানের প্রতি যে মহাব্বত হয় তা।

২. তাযীম ও বুযুর্গী এবং শ্রদ্ধা ও বড়ত্বের মহাব্বত আর এটি হলো ছেলেসন্তানের মহাব্বত পিতা-মাতার প্রতি এবং ছাত্রের মহাব্বত স্বীয় উস্তাদের প্রতি।

৩. নফস ও হৃদয়ের মহাব্বত, যা স্বামীর হয়ে থাকে স্ত্রীর প্রতি।

৪. মঙ্গল কামনা ও মানবতার মহাব্বত। এটা হলো সমস্ত মানবজাতির মহাব্বত ও ভালোবাসার পারস্পরিক সম্পর্ক।

৫. আমিত্বের মহাব্বত। এটি মানবজাতির স্বীয় জীবনের প্রতি মহাব্বত, যা উপরিউক্ত মহাব্বতসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে মজবুত মহাব্বত। এটি এমন এক মহাব্বত, যা সেই আদিকাল থেকেই মানুষের ফিতরাত ও স্বভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

চিন্তা-ভাবনার স্তর :

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথার ওপর জোর তাগিদ দিয়েছেন যে, ঈমানদার বান্দার হৃদয়জগতে আল্লাহ ও স্বীয় রাসূলের প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইশক ও মহাব্বত সকল প্রকারের মহাব্বত থেকে যেন বেশি হয়। মহাব্বতের সকল স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের হওয়া চাই। আর তা জানার একটাই উপায় রয়েছে যে, মানবজাতি নিজের সকল প্রিয় বস্তুর মধ্যে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহাব্বতে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করবে এবং দুয়ের মধ্যে তুলনা করবে। তার বিবেক অবশ্য এ ফয়সালা করবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাব্বত স্বীয় জীবনের মহাব্বতের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে সেই সহজাত মহাব্বত ও আমিত্বের বিনাশ করে। হে বিবেকবান মুসলিম সম্প্রদায়! আপনাদের জন্য সায়্যিদুনা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর জীবনাচারে রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা ও দৃষ্টান্ত।

ইমাম বোখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

'একদিন আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উমর (রা.)-এর হাত ধরে রেখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় তবে আমার জীবন ছাড়া! তখন

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এমন তো হতে পারে না, সে সত্তার শপথ, যে সত্তার কুদরতী হাতে আমার জান, যতক্ষণ না আমি তোমার হৃদয়ে স্বীয় জীবন থেকেও বেশি প্রিয় হব। হযরত উমর (রা.) বললেন, নিঃসন্দেহে এখন আপনি আমার কাছে স্বীয় জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন–হ্যাঁ, হে উমর এখন তোমার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।'

হযরত উমর (রা.)-এর প্রথম উত্তর সেই স্বভাব ও ফিতরাত অনুযায়ী ছিল, যার ওপর মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–না, তোমার ঈমান কামেল হবে না। (সে সত্তার শপথ, যে সত্তার হাতে আমার জান! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার জীবন থেকেও বেশি প্রিয় হব না। তখন হযরত উমর (রা.) একটু চিন্তা করলেন। তাতে বুঝতে সক্ষম হলেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবন থেকেও বেশি প্রিয় ও মাহবুব। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এ জীবনকে দুনিয়া ও আখিরাতের নিশ্চিত ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) তখনই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন, যে সিদ্ধান্তে তিনি চিন্তা-ফিকির করে পৌঁছলেন তাও আবার শপথ করে জানালেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এখন আপনিই আমার জীবন থেকেও বেশি প্রিয়। হযরত উমর (রা.) এক সর্বোচ্চ প্রশান্তিদায়ক উত্তর পেলেন। হে উমর! এখন থেকে আপনি পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার। সঠিক মারেফাত অর্জন হয়েছে আপনার এবং আপনি তত্ত্ব, সত্য ও বাস্তবতার সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন, যেখানে পৌঁছা জরুরি ছিল।

আমরাও যদি নিজেদের সেই ইশক ও মহাব্বতের ওপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করি তবে আমরাও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব যে, প্রিয় হাবীব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই একমাত্র আমাদের মহাব্বতের সর্বাধিক যোগ্য ও হকদার। কেননা, যখন আমরা এ বিষয়টির ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করব যে আমাদের জীবনের সকল চিরস্থায়ী নায-নিয়ামত, চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি ও চিরস্থায়ী শান-শওকাত সব কিছুই একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে অর্জিত। এটি এমন এক নিয়ামত ও মানফা'আত, যা অন্যান্য উপকারে নিয়ামতসমূহ থেকে বহুগুণে উত্তম ও উৎকৃষ্ট। তাই সুনিশ্চিতভাবে বলতে হয় পৃথিবীর সকল জিনিসের মহাববতের চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশক ও মহাব্বত বেশি হতে হবে এমন কি নিজের জীবনের মহাববতের চেয়ে বেশি। কারণ, কল্যাণসাধন ও উপকার এবং দান-অনুদান ও ইহসান, যা প্রেম-ভালোবাসার প্রতি অনুপ্রেরণাদানে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে, তা অন্যের তুলনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে, এমনকি স্বীয় সত্তার চেয়ে বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনি গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং ঐশ্বর্য-বীর্যের শীর্ষচূড়ায় সমাসীন তেমনি সকল কামালাত, বারাকাত ও ফাজায়েলের মিলনমোহনা ছিলেন।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো এমন স্বীকৃত বাস্তবতা, যা মানহৃদয়ের গভীরে মাযবুতির সাথে বসে গেছে এবং বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনায় দৃঢ় হয়ে গেছে। প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহ ও স্বীয় রাসূলের মহাব্বত ও ভালোবাসা। কেননা ইসলাম মহাব্বত ও ভালোবাসা ছাড়া কলবে প্রবেশ করে না, তবে সাধারণ মানুষ যেহেতু সেসব দান-অনুদান ও ইহসানসমূহে চিন্তা-ফিকির করার মধ্যে অলসতা করে তাই তাদের মধ্যে মহাব্বতে বহু পার্থক্য ও বেশকম দেখা দেয়। আর এ কারণেই আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার অন্যতম পদ্ধতি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা করা। এই ফাজায়েল ও মানাকেব বেশি বেশি বয়ান করা হয় যাতে করে সকলের ফায়দা হয়। সাথে সাথে অমুসলিমদের হৃদয়জগৎও যাতে উদ্ভাসিত হয় এবং হকের নৈকট্যতার মাধ্যম বনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং ফজীলত ও মানাকেব বেশি বেশি বর্ণনা করুন, যাতে এর মাধ্যমে আপনারা তাঁর মহাব্বত ও ভালোবাসার ফলসমূহ থেকে সেই আজীমুশ শান ফলটি অর্জনে ধন্য হতে পারেন, যার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত সহীহ হাদীসমূহে বর্ণিত হয়েছে, যাতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইমাম বোখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'তিনটি গুণ এমন রয়েছে, যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে যেন ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করল।'

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল জগতের সকল জিনিস থেকে তার কাছে অধিক প্রিয় হওয়া।

২. কাউকে যদি মহাব্বত করে তবে তা খালেস আল্লাহর জন্য করা।

৩. কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা।

(বোখারী শরীফ, হা-১৬, মুসলিম শরীফ, হা-৪৫)

ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে নকল করেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ হাদীস ইরশাদ করতে শুনেছেন :

ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً

'সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করে নিল যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে।' (মুসলিম শরীফ)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

সিরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা, উৎস ও ক্রমবিকাশ

মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

মানুষ স্বভাবগতভাবেই বড্ড অনুকরণপ্রিয়। জন্মলগ্ন থেকেই শিশু অনুকরণ করে তার পিতা-মাতাকে। একটু বড় হলে অনুকরণ করে তার খেলার সাথী বা বন্ধু-বান্ধবকে। আরো বড় হলে জীবন চলার পথে অনুকরণ করে পছন্দের কোনো মানুষকে। এই অনুকরণ-অনুসরণ, এটি মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই তার স্বভাবে বহন করে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, সত্যিকারার্থে এমন মানুষ আছে কি? যিনি মানুষের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয় হতে পারেন। হ্যাঁ, আছেন! তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত। (সূরা ২৪ আন-নূর, আয়াত ৫৬)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের মাঝে কেহ (পূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব। (বোখারী শরীফ)

আরেকটি হাদীসে ইরশাদ রয়েছে :

عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মাঝে কেহ (পূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমি যা আনয়ন করেছি তার অনুগামী না হয়। (মিশকাত শরীফ)

সিরাত শব্দের অর্থ :

সিরাত (سيرة) একটি আরবী শব্দ।এর শাব্দিক অর্থ পথ অনুসরণ করা। এমন প্রশস্ত পথ, যা গমন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সিরাত অর্থ ভ্রমণ করাও হয়। কারণ একজন ব্যক্তি যে পথ দিয়ে চলে গেছে সেই পথ দিয়ে আপনি তার জীবনী পড়ছেন। তার মানে আপনিও তার পথ দিয়ে ভ্রমণ করছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী পড়ছি, এর মানে আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি। তাঁর জীবনীর পথে ভ্রমণ করছি। সিরাতের আরেক অর্থ হলো, আসল অবস্থা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

তিনি (আল্লাহ) বললেন (মুসাকে), ওটা ধরো এবং ভয় করো না, আমি ওকে ওর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত ২১)

পারিভাষিক অর্থে সিরাত অর্থ জীবনী বা Biography. তবে সিরাত বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনীই বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনে যা কিছু ঘটেছে, তার সাথে সম্পৃক্ত, সরাসরি বা পরোক্ষভাবে তার সকল দিক তথা শারীরিক দিক, চারিত্রিক দিক, পারিবারিক জীবন, সামরিক জীবন, এককথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সকল দিক সিরাতের অন্তর্ভুক্ত।

সিরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সিরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। খুব সংক্ষেপে সিরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো, (১) সিরাত অধ্যয়ন একটি উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ, (২) সিরাত পাঠ মুমিনের ঈমানকে মজবুত করে, (৩) সিরাত অধ্যয়ন কোরআন বোঝার জন্য সহায়ক, (৪) সিরাত অধ্যয়ন হাদীস বোঝার জন্যও সহায়ক, (৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন মুমিনদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বা নমুনা। তাই সিরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম (৬) মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা সিরাত অনুসরণের মাঝেই নিহিত, (৭) পৃথিবীর সকল ইতিহাসের মাঝে সিরাত একটি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, (৮) ইসলামের জীবনী শক্তি বুঝতে চাইলে সিরাত পাঠের কোনো বিকল্প নেই, (৯) সিরাত একটি উত্তম সাহিত্যও বটে, (১০) আল-কোরআন হলো আল্লাহর বাণী, আর এই বাণীর জীবন্ত নমুনা হলো সিরাত, (১১) নবীজির মুহাব্বত লাভের জন্য সিরাত পাঠ অপরিহার্য, (১২) সকল উত্তম চরিত্রের সমাহার সিরাত, তাই সিরাত পাঠে উন্নত চরিত্র সৃষ্টি হয়, (১৩) সিরাত পাঠে মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়, (১৪) সিরাত পাঠ মানুষের মনকে চাঙ্গা করে, (১৫) সিরাত মানুষকে নম্র হতে শেখায়, (১৬) ইসলামী আইন বিজ্ঞানচর্চায় সিরাত একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে, (১৭) জীবন দর্শনে সিরাত পাঠের গুরুত্ব অনেক, (১৮) তর্কশাস্ত্র চর্চায় সিরাত পাঠ তার্কিকের বাচনিক ভঙ্গিকে আরো শাণিত করে।

সিরাতের উৎসসমূহ :

সিরাতের উৎস হিসেবে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে পারি। (১) আল-কোরআন, (২) আল-হাদীস, (৩) সাহাবীদের বাণী, (৪) শামায়েল বা নবীজির দৈহিক গঠন, (৫) দালায়েল বা নবীজির মুজিযাসমূহ, (৬) সাহাবীদের জীবনী, (৭) ইতিহাস।

সিরাতের ক্রমবিকাশ :

সিরাতের ক্রমবিকাশকে আমরা নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

প্রথম যুগ : সাহাবায়ে কেরামের যুগ, যা শুরু হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত লাভ থেকে এবং শেষ হয়েছে ১০৫ হিজরীতে।

দ্বিতীয় যুগ : তাবেঈ ও তাবেতাবেঈদের যুগ, যা ১০৫ হিজরীতে শুরু হয়ে ২১০

অথবা ২১৫ হিজরীতে শেষ হয়েছে।
তৃতীয় যুগ : তাবেতাবেঈদের পরবর্তী যুগ, যা ২১০ অথবা ২১৫ হিজরী থেকে ৪০০ হিজরীব্যাপী।
চতুর্থ যুগ : ইস্তিকসা ও ইসতিয়াবের যুগ, যা ৪০০ হিজরী থেকে নিয়ে ৬০০ হিজরী সনব্যাপী। ইস্তিকসা ও ইস্তিয়াব অর্থ সিরাত বিষয়ে যেখানে যা কিছু পাওয়া যায়, সেসব একত্রে সংকলনের যুগ।
পঞ্চম যুগ : Diversification বা বৈচিত্র্যতার যুগ, যা শুরু হয়েছে ৬০০ হিজরী থেকে এবং শেষ হয়েছে ১২৮০ হিজরীতে।
ষষ্ঠ যুগ : নতুন-নতুন প্রশ্ন উত্থাপনের যুগ/আধুনিক যুগ : এই যুগ ১২৮০ হিজরীর পর থেকে নিয়ে এখনো চলমান।
আধুনিক যুগে সিরাতের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি : আধুনিক যুগে এখন সিরাতকে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। নিম্নে ক্ষুদ্র পরিসরে তা তুলে ধরা হলো, (১) মুহাদ্দেসানা দৃষ্টিভঙ্গি বা হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে সিরাত রচনা : সিরাতের সকল বিষয় ইলমে হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে সনদের মান পরখ করে শুদ্ধতা, দুর্বলতা ইত্যাদি দিকগুলো বিবেচনায় এনে সিরাত রচনা করা, (২) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি : ইতিহাসের আলোকে সিরাত রচনা করা, অর্থাৎ ইতিহাস রচনায় যেমন ধারাবাহিকতা রক্ষা করে স্থান, কাল, পাত্র ফুটিয়ে তোলা হয় অনুরূপভাবে সিরাতের ঘটনাসমূহকে বিন্যাস করা, (৩) সংকলনগত দৃষ্টিভঙ্গি : ইতিপূর্বে রচিত বিভিন্ন সিরাতগ্রন্থ সামনে রেখে একটি সমন্বিত সিরাত রচনা করাকে আমরা সংকলনগত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি, (৪) ফকিহানা দৃষ্টিভঙ্গি বা ইসলামী আইন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সিরাত রচনা : এর মানে হলো সিরাতের যেসব ঘটনা থেকে ফিকহী মাসআলা বের হয় অথবা ইসলামী আইনের কোনো উৎস খুঁজে পাওয়া যায়, সেসব বিষয় সামনে রেখে যে সিরাত রচনা করা হয় এমন সিরাতগ্রন্থকে আমরা ফকিহানা দৃষ্টিভঙ্গি বা ইসলামী আইন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সিরাতগ্রন্থ বলতে পারি, (৫) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি : সিরাতের মাঝে দর্শনের যেসব উপকরণ পাওয়া যায় সেসব উপকরণ চিহ্নিত করে যে সিরাত রচনা করা হয় এমন সিরাতগ্রন্থকে আমরা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সিরাত বলতে পারি, (৬) সাহিত্যগত দৃষ্টিভঙ্গি : আরবী সাহিত্য বা বিশ্বসাহিত্যের অসংখ্য অগণিত বিষয় সিরাতের কিতাবসমূহে মণি-মুক্তার মতো চকচক করছে, এমন সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়াদি সামনে রেখে যে সিরাতগ্রন্থ রচনা করা হয় তাকে আমরা সাহিত্যগত দৃষ্টিভঙ্গির সিরাতকর্ম বলে আখ্যায়িত করতে পারি, (৭) তার্কিক দৃষ্টিভঙ্গি : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দীর্ঘ ৬৩ বছরের জীবনে তর্কশাস্ত্রের অনেক উপকরণ বিদ্যমান। যেসব সিরাতগ্রন্থের মাঝে তর্কশাস্ত্রের এমন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়, সেসব গ্রন্থকে আমরা তার্কিক দৃষ্টিভঙ্গির সিরাতগ্রন্থ বলতে পারি। পরিশেষে আল্লাহর কাছে সিরাতের ওপর আমল করার তাওফিক চাই।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছাত্রদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন কেন?

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) এক অতুলনীয় বিচক্ষণ প্রতিভার নাম। দূরদর্শী চিন্তাচেতনা ছিল তাঁর অলৌকিক দান। আমার জীবনের ৩০টি বছর পার হয়েছে তাঁর খোদাপ্রদত্ত প্রতিভার ছায়াতলে। একাধারে প্রায় ২০ বছর তাঁর ইলমে নাহু চর্চার দরছে আমি নিয়মিত বসেছি। তিনি প্রতি বছর রমাজান মাসে এ বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করতেন। পরে আমি ছাত্রদের সাথে মতবিনিময় করে সময় পার করতাম। তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদে আমি তা আজও চালিয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়ে আমার প্রতিটি শব্দ তাঁরই অবদান। যা বলি তাঁর অনুকরণে। ফকীহুল মিল্লাতের জীবন্ত আদর্শই আমাদের অনুপ্রেরণা। উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস। তিনি তাঁর এ দরসে ছাত্রদের মাঝেমধ্যে অধম সম্পর্কে কৌতূহল করে বলতেন, চার বছর আমার সাথে পটিয়ায়, হাটহাজারীতে এক বছর আমার তত্ত্বাবধানে, দেওবন্দ ও মদীনায় আমারই পরামর্শমতো। আর ২০০০ সাল থেকে বসুন্ধরায় তো আছেই। তাহলে আর কোথায় যাবে? কী করবে? থাকব তো একত্রেই মিলেমিশে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেকে একসাথে বেহেশতে শান্তিতে থাকার তৌফিক দিন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত অনেক কাহিনীই অন্তরে সাড়া দেয়। মনে পড়ে একান্ত মুহূর্তের অনেক দার্শনিক অধ্যায়। স্মরণ করি দেশ ও জাতির কল্যাণে রেখে যাওয়া তাঁর দূরদর্শী অবদান।

ছাত্রদের হাতে মোবাইল ফোন নয়, থাকবে কিতাব :

২০০০ ইং সালের কথা। বাংলাদেশে অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম মোবাইল ফোনের মাত্র সূচনা। আনন্দে সবাই আত্মহারা। এবার সবার সাথে যোগাযোগ চলবে সারাক্ষণ, অনবরত। দিন-রাত, বিরতিহীন। নেটওয়ার্ক থাকবে আবাসিক-অনাবাসিক সর্বত্র। কিন্তু একজন হুঁশিয়ার। তিনি যে বিচক্ষণ। হযরত ফকীহুল মিল্লাত সেদিন নির্দ্বিধায় সব ছাত্রকে মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে নিষেধ করেন। অবাধ্য ছাত্রকে প্রয়োজনে বহিষ্কার করেন। তিনি এ বিষয়ে ছাড় দেননি, কাউকে কোনো দিন। আমরা অনেকে সেদিন এ কঠোরতায় নিহিত রহস্য খুঁজে পাইনি। বুঝতে পারিনি এর ভবিষ্যৎ ফলাফল। আজ অনেক কাল পেরিয়ে বুঝতে শুরু করেছি। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ছাত্র, শিশু, নারী ও অবুঝদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের ভয়াবহ বিভীষিকা। শিক্ষক-অভিভাবকগণ আজ মোবাইল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় বিব্রত। এ পর্বে তাঁরা রীতিমতো ধরাশায়ী। মা-বাবার খুনি ঐশী আর আত্মহত্যাকারী স্বর্ণা আজ ঘরে ঘরে।

মোবাইল-ইন্টারনেট যখন প্রাণঘাতী মহামারী :

নারী, শিশু ও সমাজের জন্য মোবাইল-ইন্টারনেট আজ মহামারী।

আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের উপহার দিয়েছে এক নতুন সমাজ। প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করছে নতুন নতুন দিগন্ত। আর মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে তরান্বয়ের পথে বিদ্যুৎ গতিতে। বিজ্ঞান মানুষের গৌরব। মানব সফলতার শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রযুক্তি আমাদের সহায়ক। সুখ-সমৃদ্ধির একান্ত সঙ্গী। তবে জেনে রাখার বিষয়, মানব রচিত প্রায় সব কিছুই লাভ-ক্ষতি এবং উপকার-অপকারে মিশ্রিত। জীবন বাঁচানোর ওষুধেও নাকি সাইড ইফেক্ট থাকে। তাই বিশ্ব নিয়ন্তার বিধান হলো, যেসব বিষয় ভালো-মন্দ মিশ্রিত এতে যদি ভালোর পরিমাণ প্রভাবিত হয় তবেই তা গ্রহণযোগ্য। আর যদি এতে ক্ষতির দিক প্রভাবিত হয় তা হবে বর্জনীয় ও পরিত্যাগযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলুন এ দুটিতে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।' [বাকারা-২১৯]

বলাবাহুল্য, স্বপ্নের প্রযুক্তি মোবাইল-ইন্টারনেট বর্তমানে অপব্যবহারের বিপৎসীমা অতিক্রম করছে। বয়ে আনছে অগ্রগতির অন্তরালে অবনতি। প্রগতির নামে দুর্গতি। অপরাধীরা আজ এ প্রযুক্তিকে অস্ত্র হিসেবে লুফে নিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে হ্যাকিং, সাইবার সন্ত্রাস, প্রতারণা, তথ্য চুরি, চাঁদাবাজি, মুক্তিপণ দাবি এবং নারী নির্যাতন, ইভ টিজিং, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও শিশু হত্যা প্রতিদিন আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলছে। প্রতারণামূলক বিষাক্ত প্রেমের ফাঁদ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও পারিবারিক কলহের অন্যতম কারণ এই প্রযুক্তি। ইন্টারনেট, ইউটিউব ও ফেসবুকে আপত্তিকর বিষয় ছড়িয়ে দিয়ে অসহায় ভুক্তভোগী নারী-কিশোরীদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিশু-কিশোরদের পড়ালেখাতে প্রতিবন্ধকতার বিষয়টা তো সুস্পষ্ট। সস্তায় কলরেট, ইন্টারনেট পেয়ে অবৈধ প্রেম, ভিডিও দেখা এবং গেম খেলায় ঝুঁকে থাকছে রাতজুড়ে। ইতিমধ্যেই ১৩ বছরের কিশোরী স্বর্ণাসহ অনেকের প্রাণ নিল 'ব্লু হোয়েল' গেম বা নীল তিমি। 'নীল তিমি' বা ভয়ংকর আত্মঘাতী গেম 'ব্লু হোয়েল' নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তান রীতিমতো ধরাশায়ী। পশ্চিমা দেশে এ গেমসের কুপ্রভাব নিয়ে তোলপাড় চলছে আগে থেকেই। এবার

কয়েকটি আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেল আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে। গ্রাস করছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশু-কিশোরদের অকাতরে। কেড়ে নিচ্ছে তাদের অবুঝ প্রাণ নীরবে।

অনেক ক্ষেত্রে উস্কানিমূলক বক্তব্য ও বিভ্রান্তিমূলক ভুয়া তথ্য ফেসবুকে প্রকাশ করে সমাজে অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করা হয়। কক্সবাজারের রামুতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে এবং সাম্প্রতিককালে রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ফেসবুকের মাধ্যমেই উৎপত্তি হয়েছিল। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বড় বড় হামলা, বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ চুরির মতো ভয়ংকর ঘটনা আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি অপব্যবহারেরই ফসল। এ ছাড়া মাদক চোরাচালান, ব্ল্যাক মার্কেট ও অসংখ্য অনৈতিক ও অবৈধ কাজের সহজ মাধ্যম হিসেবে অনেকে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করছে। আল-কোরআন তাদেরকেই যেন সতর্ক করে বলছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

'এক শ্রেণির লোক আছে, যারা অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে, আল্লাহর পথ (সঠিক রাস্তা) থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আর এসব নিয়ে ঠাট্টা-উপহাসের আসর জমায়। সুতরাং তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও।' [সূরা লোকমান-৬]

ফেসবুকে মিথ্যা প্রচার :

মিথ্যা বলা, মিথ্যা কাজে অংশ নেওয়া, শেয়ার, লাইক দেওয়া ও সহযোগিতা করা সবই হারাম, কবিরা গোনাহ মহাপাপ। সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুকে আজ এ মহামারী দেদার চলছে। যাদের সাথে ইসলাম ও দ্বীন-ধর্মের সম্পর্ক নেই, তাদের তো কোনো তোয়াক্কা নেই। মিথ্যা তাদের উপহাস ও আনন্দ-উল্লাসের নিত্য সঙ্গী। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ইসলাম প্রচারের নামে অনেকে এই অপকর্মের আশ্রয় নিচ্ছে ব্যাপকভাবে। কেউ সরলপ্রাণ মানুষকে বোকা বানিয়ে ইসলাম প্রচারের দোহাই দিয়ে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দিচ্ছে। কেউ আবার ভুয়া আইডি বা পেজ ব্যবহার করে আল্লাহ-রাসূলের নামে কাল্পনিক কিছু সাজিয়ে সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। সাম্প্রতিককালে নভেম্বর ২০১৭-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রচারিত পেজে দেখলাম, অং সান সু চির হিজাব পরা ছবি। নিচে লেখা, "ইসলাম গ্রহণ করেছে অং সান সু চি।" অপর স্থানে দেখা গেল, "সনাতন ধর্ম গ্রহণ করলেন নওয়াজ শরিফের ভাতিজি। সবাই আশীর্বাদ করুন।" আরেক পেজে দেখা গেল, "যজ্ঞ ছেড়ে একজন এখন হিন্দু। দেখামাত্রই পোস্টটি শেয়ার ও দাদাকে আশীর্বাদ করুন।" এমন হাজারো ভুয়া খবরের অন্যতম মাধ্যম এই ফেসবুক। যারা তা পোস্ট, শেয়ার ও লাইক করে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে খেলা করছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা মারাত্মক গোনাহ ও মহাপাপে জড়িত আছে। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন–

إياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار۔

"মিথ্যা থেকে সাবধান! নিশ্চয়ই মিথ্যা সর্বপ্রকার অপকর্মের দিকে ধাবিত করে। আর অপকর্ম আগুনের দিকে ধাবিত করে।" (সহীহ বোখারী-৫৭৪৩, সহীহ মুসলিম-৬৩০)

ফেসবুক ও ইন্টারনেটে ছবি ব্যবহার :

ফেসবুক, ইন্টারনেট, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমু ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া স্বেচ্ছায় নিজের অথবা অপর কোনো প্রাণীর ছবি প্রকাশ করা অবৈধ। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত থেকে এই মর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া প্রদান করেছে। ওই ফাতওয়ার ভাষ্যমতে, নিজের অথবা কোনো প্রাণীর ছবি তুলে ফেসবুক-ইন্টারনেট ইত্যাদিতে আপলোড দেওয়া জায়েয নয়। এই বিধান জনসাধারণ এবং আলেম সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই যারা জেনেশুনে-স্বেচ্ছায় নিজেদের ছবি ফেসবুক-ইন্টারনেটে আপলোড করে বা করায় তাদের এই কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। চাই আপলোডকারী বা আপলোডের নির্দেশদাতা যে কেউ হোক। (দারুল ইফতা : দারুল উলূম দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত। ফাতওয়া নং-১৫৪৬৮২)

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন–

إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون۔ بخارى، وفى روايته يقال لهم احيوا ما خلقتم۔

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তিযোগ্য যারা ছবি উঠায়।" অপর বর্ণনায় আছে, "তাদেরকে বলা হবে তোমরা যাদেরকে বানিয়েছ তাদের প্রাণ দাও।" (সহীহ বোখারী-৫৯৫০ ও ৫৯৫১)

বর্তমান পরিসরে সামাজিক উন্নতি-অগ্রগতির সহায়ক আধুনিক প্রযুক্তি বন্ধ করা যাবে না। বন্ধ করা যাবে না স্বাচ্ছন্দ্যের এই অসাধারণ মাধ্যমগুলো। তবে অভিভাবক মহল, শিক্ষক ও গুরুজন, জাগ্রত সমাজ প্রতিনিধি, সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হতে হবে। অপরাধ প্রবণতা ও প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে সবাইকে যৌথভাবে। প্রাণঘাতী প্রবণতাকে রোধ করতে হবে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে। আমাদের শিশু-কিশোরদের অনাগত ভবিষ্যৎ নিরাপদ ও আলোকিত করতে হবে আল-কোরআনের আদর্শে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমরা সবাই দায়িত্ববান, আর সবাই তার আপন দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি, দলপতি, দায়িত্ববান, পরিবারের কর্তা দায়িত্ববান, মহিলা তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের দায়িত্ববান, এ মর্মে তোমাদের সবাই দায়িত্ববান এবং সবাই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' (সহীহ বোখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে যুগের গতি-মতি বুঝে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার তৌফিক দিন। আমীন!

মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি

কারী জসীম উদ্দীন কাসেমী

মানবজাতির ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বুঝতে এবং অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পথে মূল নিয়ামক হলো শিক্ষা। যেকোনো জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে শিক্ষার ওপরই। ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তিও ইসলামী শিক্ষা এবং তার ওপর আমল। তাই ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিক্ষা এবং তদানুযায়ী আমল করা। রাসূল (সা.)-এর ওপর আল্লাহ তা'আলার প্রথম নির্দেশ হলো 'ইকরা', অর্থাৎ "পাঠ করো তোমার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" স্বয়ং রাসূল (সা.) নিজে মুআল্লিম তথা শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন-হাদীসে শিক্ষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজীলত সম্পর্কে অসংখ্য বাণী পাওয়া যায়। তা এক দীর্ঘ অধ্যায়। আমরা এখানে রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনি ইলম বিস্তারে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা :

নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর মহানবী (সা.)-এর ওপর দ্বীন প্রচারের অংশ হিসেবে ইলম চর্চা এবং পৃষ্ঠপোষকতাকে বাধ্যতামূলক হিসেবেই গুরুত্ব দেন। ফলে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্নয়নে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হিজরত-পরবর্তী জীবনে মহানবী (সা.) মসজিদকে মূল শিক্ষায়তন হিসেবে গ্রহণ করে সকল মুসলমানের জন্য শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যকীয় করে দিলেও মূলত মক্কায় অবস্থানকালেই নওমুসলিম কিংবা যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে, এমন অমুসলিমদের শিক্ষা প্রদানের জন্য সাফা পাহাড়ের পাদদেশে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আরকাম বিন আবুল আরকামের বাড়িকে মাদরাসা হিসেবে ব্যবহার করেন। সে হিসেবে দারুল আরকামই ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদরাসা। রাসূল (সা.) স্বয়ং এখানে শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা), হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা), হযরত আলী ইবনে আবী তালিবসহ (রা.) প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণ এখানকার উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন। মদীনায় হিজরতের পূর্বে আকাবার শপথের মাধ্যমে যারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তাদের প্রশিক্ষিত করতে তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমাইরকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় দারুল আরকামে শিক্ষাদানের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম ও মুসআব বিন উমাইরের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হিজরতের পর মক্কায় অবশিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে দারুল আরকামের মাধ্যমেই দাওয়াতে ইসলামের কর্মকাণ্ড জারি রাখা হয়।

নবুওয়াতের প্রথম দিকে বিশেষত মক্কী জীবনে ইসলামের বুনিয়াদি জ্ঞান ও ইবাদতের নিয়মকানুন শিক্ষাগ্রহণই পাঠ্যভুক্ত ছিল। এ সময়কার পাঠ্যসূচিতে আল-কোরআনকেই প্রধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তা ছাড়া কিছুসংখ্যক সাহাবীকে তিনি পবিত্র কোরআনের লিপিকার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তাদেরকে

হস্তলিপিবিশারদ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বোন ফাতিমার নিকট সূরা ত্বহার লিখিত হস্তলিপি পাওয়া গিয়েছিল।

হিজরতের পর মহানবী (সা.) মসজিদে নববীতে সাহাবীদের শিক্ষাদান করতেন, যা ইতিহাসে 'মাদরাসাতুস সুফফা' নামে অভিহিত ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে মুসলমানগণ এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে গিয়ে স্বগোত্রের লোকদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন। হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর হওয়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রা.)-কে মসজিদে নববীর প্রথম শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে উবাদা ইবনে সামিত (রা.) শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দিদের 'প্রতিজন যুদ্ধবন্দির মুক্তির জন্য ১০ জন মুসলমানকে শিক্ষা দেওয়ার শর্তে মুক্তি' দিয়ে তাদেরকেও শিক্ষক হিসেবে কাজে লাগান। তারা মূলত অক্ষর জ্ঞান, তথা ভাষাজ্ঞান তৈরিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিত। প্রথমদিকে এখানকার ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ২০-২৫ জন। পরবর্তীতে এ সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর যুগের যে কয়জন কারী, মুফাসসীর, মুহাদ্দীস, মুফতী, ফকীহর সন্ধান পাওয়া যায় তাঁরা এ শিক্ষায়তনেরই ছাত্র ছিলেন।

মাদরাসাতুস সুফফার সঠিক নিয়মে পরিচালনা ও শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানের জন্য মহানবী (সা.) একজন আরিফ বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আশফা (রা.) ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা)-কে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের খাওয়া-পরার জন্য শহরের সচ্ছল ব্যক্তিদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হতো। তবে সেখানকার শিক্ষার্থীদের অনেকেই অন্যের সাহায্য নিতে পছন্দ করত না। তারা কাঠ কেটে, পানি সরবরাহ করে এবং ছোটখাটো ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে লেখাপড়া করত। এমনকি তারা অন্যজনের খরচ নির্বাহের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করত।

মসজিদে নববী ছাড়াও সেই সময় মদীনায় কয়েকটি স্থানে মসজিদভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে ইসলামের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ইতিহাস পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– মসজিদ-ই-বনি যুরায়েখ, কুবা মসজিদ, নকিমুল খাজামাত এবং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানের গামীমের তালিমী মাদরাসা। মহানবী (সা.) স্বয়ং এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতেন। মসজিদে কুবায় তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই গমন করতেন।

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষানীতি :

হযরত রাসূল (সা.)-এর শিক্ষানীতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, 'তিনিই সেই পবিত্র সত্তা, যিনি উম্মি লোকদের মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন, তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও প্রজ্ঞা। যদিও ইতিপূর্বে তারা ভ্রান্তিতে (অজ্ঞতায়) মগ্ন ছিল।' সূরা জুমা : ০২

তাঁর অনুপম শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিতে মুগ্ধ ছিলেন তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবী ও শিষ্যগণ।

عن معاوية بن الحكم السلمى--- فبأبى وامى! ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، فوالله ! ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) বলেন, 'তাঁর জন্য আমার বাবা ও মা উৎসর্গিত হোক। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহ তা'আলার শপথ! তিনি কখনো কঠোরতা করেননি, কখনো প্রহার করেননি, কখনো গালমন্দ করেননি।' (মুসলিম শরীফ ১/৩৮১ হা. ৫৩৭)

উপযুক্ত পরিবেশ :

শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ জরুরি। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষা করতেন।

عن جرير بن عبد الله قال قال لى رسول الله ﷺ فى حجة الوداع: استنصت الناس ثم قال: لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। 'নিশ্চয়ই বিদায় হজের সময় রাসূল (সা.) তাঁকে বলেন, মানুষকে চুপ করতে বলো। অতঃপর তিনি বলেন, আমার পর তোমরা ফুফুরীতে ফিরে যেয়ো না।' (বোখারী শরীফ ৮/৪২৭)

এতে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থির হওয়ার এবং মনোসংযোগ স্থাপনের পর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে শিক্ষাদান শুরু করতেন।

থেমে থেমে পাঠদান :

রাসূলুল্লাহ (সা.) পাঠদানের সময় থেমে থেমে কথা বলতেন। যেন তা গ্রহণ করা শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়। দ্রুত কথা বলতেন না, যেন শিক্ষার্থীরা ঠিক বুঝে উঠতে না পারে আবার এত ধীরেও বলতেন না, যাতে কথার ছন্দ হারিয়ে যায়। বরং তিনি মধ্যম গতিতে থেমে থেমে পাঠদান করতেন।

عن ابى بكرة قال : خطبنا النبى ﷺ فقال اتدرون اى يوم هذا؟ --- اى شهر هذا؟--- اليس ذو الحجة ؟ --- اى بلد هذا؟ ---

হযরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা কি জানো, আজ কোন দিন? এটি কোন মাস? এটি কি যিলহজ নয়? এটি কোন শহর?' (বোখারী শরীফ ২/৫৩৬, হা. ১৭৪১)

প্রতিটি প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকেন এবং সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।'

অঙ্গভঙ্গির সমন্বয় :

রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে, তাঁর দেহাবয়বেও এর প্রভাব প্রতিফলিত হতো। এতে বিষয়ের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রোতা-শিক্ষার্থীগণ সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হয় এবং বিষয়টি তার অন্তরে গেঁথে যায়। যেমন– তিনি যখন জান্নাতের কথা বলতেন, তখন তাঁর দেহে আনন্দের স্ফুরণ দেখা যেত। জাহান্নামের কথা বললে ভয়ে চেহারার রং বদলে যেত। যখন কোনো অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে বলতেন, তাঁর চেহারায় ক্রোধ প্রকাশ পেত এবং কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত।

عن جابر بن عبد اللهؓ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) যখন বক্তব্য দিতেন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেত। যেন তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী।' (সহীহ মুসলিম ২/৫৯২ হা. ৮৬৭)

গল্প বলার মিষ্টি ভঙ্গি :

গল্প-ইতিহাস জ্ঞানের সমৃদ্ধ এক ভাণ্ডার। শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষককে অনেক সময় গল্প-ইতিহাস বলতে হয়। রাসূল (সা.)ও পাঠদানের সময় গল্প বলতেন। তিনি গল্প বলতেন অত্যন্ত মিষ্টি করে। এমন মিষ্টি ভঙ্গি গল্প-ইতিহাস স্বপ্রাণ হয়ে উঠত। জীবন্ত হয়ে উঠত শ্রোতা-শিক্ষার্থীর সামনে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلَّا ثَلاَثَةٌ :عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ---قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى ٢)) صَبِىِّ الصَّبِىِّ وَوَضَعَهُ إِصْبَعَهُ فِى فَمِهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'দোলনায় কথা বলেছে তিনজন। হযরত ঈশা ইবনে মরিয়ম (আ.)। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি (মুগ্ধ হয়ে) রাসূল (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি আমাকে শিশুদের কাজ সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি তাঁর মুখে আঙুল রাখলেন এবং তাতে চুমু খেলেন।' (মুসনাদে আহমদ : ৮০৭১)

অর্থাৎ তিনি শিশুদের মতো ঠোঁট গোল করে তাতে আঙুল ঠেকালেন।

প্রশ্ন করা :

রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন করতেন। যেন তারা প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তর খুঁজতে অভ্যস্ত হয়। কেননা নিত্যনতুন প্রশ্ন

শিক্ষার্থীকে নিত্যনতুন জ্ঞান অনুসন্ধানে উৎসাহী করে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مُعَاذُ أَتَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟، قَالَ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ :أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِى مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟، قَالَ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ :أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে মুআজ! তুমি কি জানো বান্দার নিকট আল্লাহর অধিকার কী? তিনি বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।' রাসূল (সা.) বলেন, 'তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করা।' (সহীহ বোখারী : ৭৩৭৩)

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা :

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে অনেক বেশি মনোযোগী হয়। একাগ্র হয়ে শিক্ষকের আলোচনা শোনে। রাসূল (সা.) পাঠদানের সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতেন।

عَنْ أَبِى سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى--- ثُمَّ قَالَ لِى :لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِىَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِى القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، قُلْتُ لَهُ :أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِىَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِى القُرْآنِ، قَالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ---

হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) তাঁকে বলেন, 'মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে কোরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দেব। তিনি বলেন, আমি যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, তোমাকে বলিনি! মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কোরআনের সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দেব। অতপর তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহী রাব্বীল আলামীন।' (বোখারী শরীফ ৫/১৭৩, হা. ৪৪৭৪) অর্থাৎ রাসূল (সা.) তাঁকে সূরা ফাতিহা শিক্ষা দেন।

আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন :

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন করতেন। যেন শেখানো বিষয়টি দ্রুত ও ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مَنْ يَأْخُذُ مِنِى خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ "قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ .قَالَ " :فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَدَّهُنَّ فِيهِنَّ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে কে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে এবং তার ওপর আমল করবে? তিনি বলেন, আমি বলি, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন। (মুসনাদে আহমদ : ৮০৯৫)

উপমা দিয়ে বোঝানো :

নবী করীম (সা.) অনেক সময় কোনো বিষয় স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও উদাহরণ পেশ করতেন। কেননা উপমা ও উদাহরণ দিলে যেকোনো বিষয় বোঝা সহজ হয়ে যায়।

عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى

হযরত সাহাল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব। হজরত সাহাল (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন।' (বোখারী শরীফ ৭/১০১ হা. ৬০০৫)

শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গ্রহণ এবং প্রশ্নের জন্য প্রশংসা করা :

শিক্ষকের আলোচনা শ্রবণে শিক্ষার্থীদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এসব প্রশ্নের সমাধান না পেলে অনেক সময় পুরো বিষয়টিই শিক্ষার্থীর নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। সে পাঠের পাঠোদ্ধার করতে পারে না। আর প্রশ্নের উত্তর দিলে বিষয়টি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনে আরো আগ্রহী হয়। রাসূল (সা.) শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গ্রহণ করতেন এবং প্রশ্ন করার জন্য কখনো কখনো প্রশ্নকারীর প্রশংসাও করতেন।

عن أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ -أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ -أَوْ يَا مُحَمَّدُ -أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ :فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ :لَقَدْ وُفِّقَ، أَوْ لَقَدْ هُدِيَ

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করে, আমাকে বলুন! কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে এবং কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। নবী করীম (সা.) থামলেন এবং তার সাহাবাদের দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন, তাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে বা তাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে।' (সহীহ মুসলিম ১/৪২: ১৩)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূল (সা.) প্রশ্নটি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি। বরং তিনি চুপ থাকেন এবং সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রশ্নকারীর প্রশংসা করেন। যাতে প্রশ্নটির ব্যাপারে সকলের মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সকলেই উপকৃত হতে পারে।

আমলের মাধ্যমে শিক্ষাদান :

শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো প্রায়োগিক শিক্ষা। রাসূল (সা.) অধিকাংশ বিষয় নিজে আমল করে সাহাবীদের শেখাতেন। শেখাতেন হাতে-কলমে। এ জন্য হযরত আয়েশা (রা.) বলেন :

كان خلقه القرآن

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো কোরআন। (মুসনাদে আহমদ ৬/১৬৩, হা. ২৫৩০২)

عن مالك بن الحويرث قال قال لنا

رسول الله ﷺ صلوا كما رأيتموني اصلي

রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা নামায আদায় করো, যেমন আমাকে আদায় করতে দেখো।' (সুনানে বায়হাকী ২/৩৪৫, হা. ৩৯১৩)

বিবেককে জাগ্রত করা :

বিবেক মানুষের বড় রক্ষক। বিবেক জাগ্রত থাকলে মানুষ নানা অপরাধ থেকে বেঁচে যায় এবং বিবেক লুপ্ত হলে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি সহজ উপায় হলো, মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। রাসূল (সা.) বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষাদান করেছেন। যেমন :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ :إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا :مَهْ .مَهْ .فَقَالَ ": ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا ."قَالَ :فَجَلَسَ قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ "قَالَ :لَا .وَالله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ .قَالَ " :وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ ."قَالَ " :أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ " قَالَ لَا--- .قَالَ " :أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ قال لا --- ."قَالَ " :أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ "قَالَ :لَا--- ."قَالَ " :أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ "قَالَ :لَا.

হযরত আবু উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুবক রাসূল (সা.)-কে বলল–হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। তার কথা শুনে উপস্থিত লোকজন মারমুখী হয়ে উঠল এবং তিরস্কার করল। রাসূল (সা.) তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ করো? সে বলল, আল্লাহর শপথ না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। রাসূল (সা.) বললেন, কেউ তার মায়ের ব্যাপারে এমন পছন্দ করে না। এরপর রাসূল (সা.) একে একে তাঁর সব নিকট নারী আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং সে 'না' উত্তর দেয়। এভাবে রাসূল (সা.) তার বিবেক জাগ্রত করে তোলেন। (মুসনাদে আহমদ ৫/২৫৬, হা. ২২২১১)

রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট করা :

কখনো কখনো কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য রাসূল (সা.) রেখাচিত্র ও অঙ্কনের সাহায্য নিতেন। যেন শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে তা রেখাপাত করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ :خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوَسَطِ، وَقَالَ " :هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ -أَوْ :قَدْ أَحَاطَ بِهِ -وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) একটি চার কোনা দাগ দিলেন। তার মাঝ বরাবর দাগ দিলেন। যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে এবং চতুষ্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দিলেন। তিনি বললেন, এটি মানুষ। চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন এবং দাগের যে অংশ বের হয়ে গেছে সেটি তার আশা।' (বোখারী শরীফ ৭/২৯৯, হা. ৬৪১৮)

বারবার পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ :

রাসূলে আকরাম (সা.) শিক্ষার্থীদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর না করে বারবার পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন; বরং বারবার পাঠ করে কঠিন বিষয়কে আয়ত্ত করতে বলতেন।

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا

হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা কোরআনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন তা উটের চেয়ে দ্রুত স্মৃতি থেকে পলায়ন করে।' (সহীহ বোখারী : ৫০৩৩)

আশা ও ভয়ের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি

রাসূলে আকরাম (সা.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের অনাগত জীবন সম্পর্কে যেমন আশাবাদী করে তুলতেন, তেমনি তার চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন। যেমন :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ :خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ :لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) একটি ভাষণ দিলেন। আমি এমন ভাষণ আর শুনিনি। তিনি বলেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।' (বোখারী শরীফ ৫/২৩০, হা. ৪৬২১)

عن ابي ذرؓ عن النبي ﷺ فقال: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ "قُلْتُ :وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ :وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

হযরত আবু জর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলল এবং তার ওপর মৃত্যুবরণ করল, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? রাসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ। যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে।' (বোখারী শরীফ ৭/৫৬, হা. ৫৪২৭)

মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান :

মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বহু জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজ হয়ে যায় এবং উত্তম সমাধান পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও বহু বিষয় মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। সমাধান বের করতেন। যেমন–হুনায়নের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন নিয়ে আনসার সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলে রাসূল (সা.) তাদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করেন। একইভাবে বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। (বোখারী শরীফ ৪/৩৯২. হা. ৩১৪৭ ও মুসলিম শরীফ ২/৭৩৩, হা. ১০৫৯)

গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি :

রাসূল (সা.) তাঁর পাঠদানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) তাঁর কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেন তা ভালোভাবে বোঝা

যায়।' (শামায়েলে তিরমিযী : ২২২)

ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাদান :

রাসূলুল্লাহ (সা.) ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন।

عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করে যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি নামায দীর্ঘায়িত করে ফেলে। আমি উপদেশ বক্তৃতায় রাসূল (সা.)-কে সেদিনের তুলনায় আর কোনো দিন বেশি রাগ হতে দেখিনি। রাসূল (সা.) বলেন, 'হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমরা অনীহা সৃষ্টিকারী। সুতরাং যে মানুষ নিয়ে (জামাতে) নামায আদায় করবে, সে তা যেন হালকা করে (দীর্ঘ না করে)। কেননা তাদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল ও জুল-হাজাহ (ব্যস্ত) মানুষ রয়েছে। (বোখারী শরীফ ১/৩৮ হা. ৯০)

শাস্তিদানের মাধ্যমে সংশোধন :

গুরুতর অপরাধের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো তাঁর শিষ্য ও শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করে সংশোধন করতেন। তবে রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় শারীরিক শাস্তি এড়িয়ে যেতেন। ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। যেমন–উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.)সহ কয়েকজনের সঙ্গে রাসূল (সা.) কথা বলা বন্ধ করে দেন, যা শারীরিক শাস্তির তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ ছিল।

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতির সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো।

রাসূল (সা.)-এর এই শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলামী শিক্ষা, দাওয়াত ও আদর্শের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটান। তৎপরবর্তী তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ইমাম-মুজতাহিদীন একই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ইসলামের যাবতীয় খিদমাত আঞ্জাম দিতে থাকে। উপমহাদেশেও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবেতাবেঈনের যুগে রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। এই ধারায় ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশে হাজারো মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসনামলগুলোতে এই শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল উপমহাদেশের মূল শিক্ষাব্যবস্থা। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই শিক্ষাব্যবস্থার পতন ঘটে। মুসলমানদের কাছ থেকে ইংরেজ শাসক তাদের এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা ছিনিয়ে নেওয়ার হরেক রকম অপপ্রয়াস চালাতে থাকে। তা এক দীর্ঘ করুণ ইতিহাস। পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ধারাকে পুনরুদ্ধার করা হয়। সে ধারাতেই উপমহাদেশে আজ লাখো মাদরাসা। বাংলাদেশে কওমী মাদরাসা নামেই এসব মাদরাসা পরিচিত। শিক্ষা ও আমলের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণেই পরিচালিত। এখানকার পাঠ্যতালিকাও সেই আদলে প্রণোদিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই শিক্ষাধারাকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখেন। আমীন।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

তালাকের আইনে বিকৃতি ও সংশোধনী-৩

মুফতী শরীফুল আজম

ইদ্দত পালন :

শরীয়তের পরিভাষায় বিবাহের অবশিষ্ট আছর নিঃশেষ হওয়ার জন্য ধার্য সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়। স্ত্রী লোক ওই সময় গর্ভাশয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকে :

فالعدة فى عرف الشرع اسم لاجل ضرب لانقضاء مابقى من آثار النكاح (بدائع الصنائع سعيد ٣/١٩٠)

واولى منه قول ابن كمال هى اسم لأجل ضرب لانتفاء ما بقى من آثار النكاح اوالفراش لشموله عدة ام الولد (شامى سعيد ٣/٥٠٣)

وفى الاصطلاح : هى اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها (الموسوعة الفقهية ٢٩/٣٠٤)

ইদ্দতের সমর্থবোধক আরো কয়েকটি শব্দ রয়েছে। যেমন الاستبراء ইস্তিবরা التربص এহদাদ এবং الاحداد তারাব্বুস। তবে এগুলোর মাঝে বিভিন্ন দিক থেকে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। ইদ্দতের কারণ পাওয়া গেলে ইদ্দত পালন চার মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মতে ওয়াজিব। পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

والمطلقات يتربصن الخ (البقرة:٢٢٨)

والّئى يئسن الخ (الطلاق:٤)

والذين يتوفون منكم الخ (البقرة:٢٣٤)

হাদীস শরীফে এসেছে :

لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا (مسلم ٢/١١٢٧)

নবীজি (সা.) বলেন, মহিলারা কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে পারবে না। তবে স্বামীর জন্য চার মাস ১০ দিন শোক পালন করবে। (মুসলিম)

انه ﷺ قال لفاطمة بنت قيس اعتدى فى بيت ابن ام مكتوم (مسلم ٢/١١١٤)

নবীজি (সা.) ফাতেমা বিনতে কাইসকে বলেন, তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন করো। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ (ابن ماجه ١/٦٧١ رقم الحديث٢٠٧٧)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, বারিরাকে তিন হায়েজের মাধ্যমে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। (ইবনে মাজাহ)

কোরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি উম্মতের ইজমা দ্বারাও ইদ্দত পালনের বিষয়টি প্রমাণিত। নবীজি (সা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা উম্মত ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইদ্দত পালনকে ওয়াজিব বলে আসছে।

ইদ্দত কখন পালন করবে?

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সহবাস অথবা নির্জনবাসের পর তালাক, ফসখ বা লেআনের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙে গেলে ইদ্দত পালন করতে হয়। অনুরূপ বিবাহের পর স্বামী মারা গেলেও ইদ্দত পালন করতে হবে, সহবাস হোক বা না হোক।

ইদ্দত পালনের রহস্য :

শরীয়তে ইদ্দত পালনের যে বিধান রাখা হয়েছে তাতে বিভিন্ন হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে।

(ক) গর্ভাশয় খালি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, যাতে একজনের পানি অপরের ক্ষেত সিঞ্চন না করে। এতে বংশপরিচয়ে বিভ্রাট ঘটতে পারে।

(খ) বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর মর্যাদা সমুন্নত করা।

(গ) তালাকদাতার জন্য তালাক প্রত্যাহারের সময় দীর্ঘায়িত করা, যাতে এর মাঝে সে অনুতপ্ত হয়ে রজআত করার সুযোগ পায়।

(ঘ) ইদ্দতের মাঝে সাজসজ্জা পরিহারের মাধ্যমে স্বামী হারানোর পরিণতি তুলে ধরা। এ কারণেই পিতা-মাতা বা সন্তানের শোকের চেয়ে স্বামীর জন্য দীর্ঘদিন শোক পালনের বিধান রাখা হয়েছে।

(ঙ) তা ছাড়া স্বামীর হক রক্ষা, স্ত্রীর স্বার্থরক্ষা, সন্তানের বংশপরিচয় রক্ষা এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনের মতো বৃহৎ চারটি হক সংরক্ষণ হয়ে থাকে ইদ্দত পালনের মাধ্যমে। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যা)

ইদ্দতের প্রকার :

ফুকাহায়ে কেরামের মতে ইদ্দত তিন প্রকার।

১. কুরু, তথা হায়েজের মাধ্যমে ইদ্দত পালন।

২. মাস গণনা করে ইদ্দত পালন।

৩. সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালন।

فالعدد فى الشرع انواع ثلاثة عدة الاقراء وعدة الاشهر وعدة الحبل (بدائع٣/١٩١)

এক. হায়েজের মাধ্যমে ইদ্দত পালনের বিধান ওই সকল স্ত্রী লোকের বেলায় প্রযোজ্য, যারা ঋতুবতী। সহবাস বা নির্জনবাসের পর মৃত্যু ছাড়া তালাক ফসখ ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভেঙে

গেলে তিন হায়েজ বা মাসিক ঋতুর মাধ্যমে তারা ইদ্দত পালন করবে। (সূরা বাকারা-২২৮)

দুই. মাস গণনা করে ইদ্দত পালনের ক্ষেত্র দুটি–

(ক) হায়েজের পরিবর্তে মাস হিসেবে ইদ্দত। এটা ওই সকল তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী লোকের বেলায় প্রযোজ্য, যাদের বয়স কম বা বেশি হওয়ার কারণে হায়েজ বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ শিশু বা বৃদ্ধা অথবা বয়সে সাবালিকা কিন্তু কোনো কারণে মাসিক আরম্ভ হয়নি। তিন হায়েজের স্থলে তারা তিন মাস গণনা করে ইদ্দত পালন করবে। (সূরা তালাক-৪)

(খ) বিধবা নারীর ইদ্দত চার মাস ১০ দিন। গর্ভবতী না হলে সকল প্রকার স্ত্রী লোকের বিধান এটি। বিবাহের পর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তাদের এই ইদ্দত পালন করতে হবে। সহবাস/নির্জনবাস হোক বা না হোক। হায়েজ চালু থাক বা বন্ধ। সর্বাবস্থায় এ বিধান প্রযোজ্য। (সূরা বাকারা-২৩৪)

তিন. সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দতের বিধান গর্ভবতী নারীদের বেলায় প্রযোজ্য। তালাকের ইদ্দত হোক বা স্বামী মৃত্যুজনিত ইদ্দত। গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তারা ইদ্দত পালন করবে। সময় কমবেশি যা-ই হোক। এমনকি স্বামী মৃত্যুর এক মুহূর্ত পরও যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তবে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। (সূরা তালাক-৪)

নবীজি (সা.)-এর যুগে সুবাইয়া আসলামী (রা.) স্বামী ইন্তেকালের কয়েক দিন পর সন্তান প্রসব করেন এবং নবীজি (সা.)-এর কাছে অন্যত্র বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবীজি (সা.) তাঁকে অনুমতি দিয়ে দেন। (মুসলিম)

ان ام سلمة قالت ان سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وانها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فامرها ان تتزوج (مسلم رقم الحديث ١٤٨٥)

ইদ্দতের মাঝে রদবদল :

উল্লিখিত তিন প্রকার ইদ্দত তথা হায়েজের মাধ্যমে ইদ্দত, মাস গণনায় ইদ্দত ও প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত। উক্ত ইদ্দতসমূহের মাঝে মৌলিকভাবে চার ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

(এক). অনেক সময় মাস গণনার পরিবর্তে হায়েজ গণনা করা। যেমন–কোনো স্ত্রী লোকের বয়স বেশি বা কম হওয়ার কারণে হায়েজ বন্ধ থাকায় সে মাস হিসেবে ইদ্দত পালন শুরু করল। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই তার মাসিক আরম্ভ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় পুনরায় হায়েজ হিসেবে ইদ্দত পালন করবে।

(দুই). অথবা হায়েজের হিসাব মাস দ্বারা পরিবর্তন হওয়া। যেমন–কোনো ঋতুবর্তী মহিলা এক-দুই হায়েজ ইদ্দত পালনের পর তার মাসিক বন্ধ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় সে মাস গণনা করে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে।

(তিন). অনেক সময় তালাকের ইদ্দত বিধবার ইদ্দত দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন–কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাকে রজঈ প্রদান করল বা সুস্থ অবস্থায় নিজ থেকে বা স্ত্রীর ইচ্ছায় তালাকে বায়েন প্রদান করল। অতঃপর তালাকের ইদ্দত চলাকালীন স্বামী মৃত্যুবরণ করল। এমতাবস্থায় তালাকের ইদ্দত বাতিল হয়ে মৃত্যুর ক্ষণ থেকে চার মাস ১০ দিন বিধবার ইদ্দত পালন করতে হবে।

আর যদি স্বামী মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীকে চাওয়া ছাড়া নিজ থেকে তালাকে বায়েন প্রদান করে, এরপর ইদ্দত চলাকালীন স্বামী মারা যায় তবে এ ক্ষেত্রে তালাকের ইদ্দত ও বিধবার ইদ্দত এতদুভয়ের মাঝে যেটা দীর্ঘ হয় তাই ইদ্দত বলে বিবেচিত হবে। অতএব স্বামী মৃত্যুর পর চার মাস ১০ দিন পুরা হওয়ার আগেই যদি তালাকের ইদ্দত মাস বা ঋতুর হিসাবে শেষ হয়ে যায় তবে বিধবার ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি চার মাস ১০ দিন পরও তিন ঋতু পূর্ণ না হয় তবে তিন ঋতু শেষ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত দীর্ঘায়িত হবে।

(চার). ইদ্দত পরিবর্তনের আরেকটি অবস্থা হচ্ছে, হায়েজ বা মাসের গণনা সন্তান প্রসব দ্বারা পরিবর্তন হওয়া। যেমন–কোনো স্ত্রী লোক হায়েজ হিসেবে বা মাসের হিসেবে ইদ্দত পালনের মাঝে বা শেষে তার গর্ভে সন্তান প্রকাশ পেল। তাহলে বুঝতে হবে ইতিমধ্যে যে রক্ত দেখা গেছে তা হায়েজ নয় বরং গর্ভ থেকে কোনো রোগের কারণে রক্ত বেরিয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্বের ইদ্দতের সকল হিসাব বাতিল হয়ে যাবে। এর পরিবর্তে তার ইদ্দত শেষ হবে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে। (বাদায়েউস সানায়ে, শামী, ফাতহুল কাদীর)

অধ্যাদেশে ইদ্দত :

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে ইদ্দতের ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহর এ সকল বিধি-বিধান উপেক্ষা করা হয়েছে। এত সব প্রকার আর এ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে সোজাসাপ্টা হিসাব করা হয়েছে ৯০ দিন। গর্ভবতী নয়, এমন সকলের ইদ্দত ঢালাওভাবে ৯০ দিন ধার্য করতে অধ্যাদেশের ৭(৩) ধারায় বলা হয়েছে, "১ নং উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে প্রেরিত নোটিশের তারিখ হইতে ৯০ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তালাক কার্যকর হইবে না।" অধ্যাদেশের ধারা ৭(৪) অনুযায়ী তালাক কার্যকর হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় স্বামী তা প্রত্যাহার করতে পারে। ধারা ৭(৬) অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলে তা কার্যকরী তালাকে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় সংসার করতে হলে বিবাহ নবায়ন করতে হবে। এই সুযোগ দুবার দেওয়া হবে। তৃতীয়বার কার্যকরী তালাকের মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ হলে এই

সুযোগ থাকবে না বরং হালালা জরুরি হবে।

এ সকল ধারা বিশ্লেষণ করলে বুঝে আসে যে ৯০ দিনকে এখানে ইদ্দত ধরা হয়েছে। এর মাঝে রজআত বা প্রত্যাহারের সুযোগ আছে ইদ্দত পার হলে বিবাহ নবায়ন করা লাগবে। আর তিনবার এমন ইদ্দত পার হওয়ার ঘটনা ঘটলে হালালা ছাড়া প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে পারবে না। অথচ পবিত্র কোরআনে গর্ভবতী নয়, এমন স্ত্রী লোকের ইদ্দত তিন হায়েজ ধার্য করা হয়েছে।

والمطلقات يتربصن

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন কুরু (ঋতুস্রাব) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। (সূরা বাকারা-২২৮)

আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে তিন ঋতুস্রাব ৯০ দিনের আগেও শেষ হতে পারে, বেশি সময়ও লাগতে পারে। বরাবর ৯০ দিনের মাথায় শেষ হওয়া জরুরি নয়। আইন প্রণেতারা কেন এ সহজ বিষয়টি বুঝতে পারল না তা বোধগম্য নয়। অতএব ঋতুবর্তীদের ক্ষেত্রে আইনটি সম্পূর্ণ কোরআনবিরোধী।

বয়সজনিত বা রোগের কারণে যাদের ঋতুস্রাব আসে না তাদের বেলায় পবিত্র কোরআন তিন মাস ইদ্দতের বিধান রেখেছে। অধ্যাদেশের ধারাটি এমন স্ত্রী লোকের বেলায়ও প্রয়োগ হতে পারে না। কারণ এখানে ইদ্দত গণনা শুরু হয় চেয়ারম্যানের হাতে নোটিশ পৌঁছার পর থেকে। আর নোটিশ পাঠানোর কোনো সময়সীমা অধ্যাদেশে ধার্য করা হয়নি। কাজেই ছয় মাস পর নোটিশ পাঠানো হলে এরপর ৯০ দিন হিসাব করে ৯ মাসে ইদ্দত শেষ হচ্ছে, যা পবিত্র কোরআনের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

গর্ভবতীর ইদ্দত :

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত কী হবে তা ঠিক করতে গিয়ে অধ্যাদেশের ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে, "তালাক প্রদানের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে ৩ নং উপধারায় বর্ণিত মেয়াদ বা গর্ভকাল এই দুইয়ের মধ্যে যাহা পরে শেষ হইবে তাহা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হইবে না।" অর্থাৎ ৯০ দিন এবং সন্তান প্রসবের সময় থেকে যেটা দীর্ঘতম হবে তা-ই ইদ্দত বলে ধর্তব্য হবে। অথচ পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

আর গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (সূরা তালাক-৪) অর্থাৎ তালাকের এক দিন পরেই যদি সন্তান প্রসব হয়ে যায় তবে ইদ্দত শেষ হয়ে গেল। এর বিপরীত অধ্যাদেশ তাকে আরো ৯০ দিন ইদ্দত পালনে বাধ্য করে।

আইন প্রণেতাদের সম্ভবত এখানে দিকভ্রম ঘটেছে। শরীয়তে ابعد الاجلين যে ইদ্দতের একটি প্রকার রয়েছে তথা মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর অনিচ্ছায় তালাকে বায়েন দিয়ে ইদ্দতের মাঝে স্বামী মারা গেলে তালাকের ইদ্দত এবং বিধবার ইদ্দতের মাঝে দীর্ঘতমটি ইদ্দত হয়ে থাকে। এ বিধানটি ভুলক্রমে তালাকের ইদ্দত এবং গর্ভের ইদ্দতের মাঝে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের এই ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে গোটা মুসলিম জাতিকে।

পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ নবায়ন :

শরীয়তের দৃষ্টিতে এক তালাক অথবা দুই তালাকে রজঈ দেওয়া হলে ইদ্দতের মাঝে স্ত্রীকে রজআতের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে পারে। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে অথবা বায়েন তালাক দিলে নতুন সূত্রে মোহর ধার্য করে বিবাহ নবায়ন করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু তিন তালাক হলে (চাই একসাথে দেওয়া হোক বা ভিন্ন ভিন্ন) বিবাহ নবায়নের সুযোগ থাকে না। তৃতীয় পুরুষের সাথে মধ্যবর্তী বিবাহ আবশ্যক হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং চার ইমাম একমত। বিস্তারিত দেখুন, মাসিক আল-আবরার, জানুয়ারি-২০১৭ 'একত্রে তিন তালাক প্রদান'।

এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু ইবনে তাইমিয়া ও কিছু আহলে যাহের। তাদের মতে, তিন তালাক একসাথে বা এক তুহুরে ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া হলে সেটা এক তালাক বলে গণ্য হবে। ইদ্দত শেষ হলেও বিবাহ নবায়ন বৈধ হবে। কিন্তু তাদের মতেও তিন তুহুরে তিন তালাক দিলে তিনটি কার্যকর হবে এবং বিবাহ নবায়ন বৈধ হবে না।

পক্ষান্তরে অধ্যাদেশের ৭(৬) ধারা মতে তিন তালাক সর্বাবস্থায় এক গণনা হবে। চাই এক তুহুরে দেওয়া হোক বা তিন তুহুরে ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া হোক। এ হিসেবে ইবনে তাইমিয়ার মতের সাথে পুরোপুরি মেলে না। অথচ অধ্যাদেশ প্রণেতা আইনজীবীরা ইবনে তাইমিয়ার নাম নিয়েই তাদের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকে।

অধ্যাদেশের ৭(৬) ধারা মতে কয় তালাক দেওয়া হলো সেটা দেখার বিষয় নয়। কার্যকরী তালাকে পরিণত হলো কি না, সেটাই মূল দেখার বিষয়। যদি কার্যকর না হয় বরং ৯০ দিনের ভেতর প্রত্যাহার করা হয় তবে সম্পর্ক বহাল থাকবে যদিও ১০০ তালাক দেওয়া হোক। আর কার্যকরী হলেও তৃতীয়বার না হলে বিবাহ নবায়ন করা যাবে। হালালা অবলম্বন করতে হবে না, যা সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী।

আইনের ত্রুটি

এক. তালাকের উচ্চারণ :

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭(১) ধারায় বলা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছা করিলে যেকোনো প্রকারেই হোক তালাক উচ্চারণ করিবার পরেই সে

তালাক দিয়াছে বলিয়া চেয়ারম্যানকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে জানাইবে ও স্ত্রীকেও ইহার একটি কপি পাঠাইবে।" উক্ত অধ্যাদেশে তালাক উচ্চারণের কোনো ধরনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অথচ তালাক হওয়া না হওয়ার বিষয়টি উচ্চারণের ওপরই ভিত্তি করে। তাই তালাকের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উচ্চারণ। সাথে সাথে সর্বাধিক জটিল হচ্ছে উচ্চারণের বিচার-বিশ্লেষণ।

অধ্যাদেশ প্রণেতাদের কাছে বিষয়টি দুর্বোধ্য মনে হওয়ায় সম্ভবত তা এড়িয়ে গেছে। উক্ত ধারার এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, "এই অধ্যাদেশে (Pronouncement) শব্দটির কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। অতএব ইসলামী আইনে উচ্চারণ কথাটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হয় এই অধ্যাদেশের ক্ষেত্রেও সেই একই অর্থ বহাল থাকিবে।" (আইআর ১৯৩২, পিসি ২৫)

আরো বলা হয়েছে, এই অধ্যাদেশের ৭(১) ধারার বিধান অনুসারে তালাক কার্যকর হওয়ার তিনটি পূর্বশর্ত রহিয়াছে, যথা (১) মুসলিম আইন অনুসারে তালাক উচ্চারণ... (পিএলডি ১৯৭৬ লাহোর ১৯৬৬)

উচ্চারণের বিষয়টি অধ্যাদেশে সম্পূর্ণ ইসলামী আইনের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। আর ইসলামী আইন মতে, উচ্চারণভেদে তালাকের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কখনো তালাক কার্যকর হয়, কখনো হয় না। সংখ্যায় কম হয়, বেশি হয়। সাথে সাথে হয় আবার শর্ত পাওয়া গেলে হয়। রজঈ, বায়েন বা মুগাল্লাজা হয়। (বিস্তারিত দেখুন মাসিক আল-আবরার মার্চ-২০১৭ 'উচ্চারণভেদে তালাক')

অথচ অধ্যাদেশে সকল প্রকার তালাক চেয়ারম্যানের হাতে নোটিশ পৌঁছার ৯০ দিন পর কার্যকর হবে বলা হয়েছে। আর যত তালাকই উচ্চারণ করুক তা এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে। যেকোনো তালাকই প্রত্যাহার করা যাবে। অতএব এ অধ্যাদেশ তালাক উচ্চারণের শরয়ী নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। তাই অধ্যাদেশের ধারার সাথে মুসলিম আইনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ১-২ তালাকে রজঈ উচ্চারণ করতে হবে। তবেই তা ইদ্দতের ভেতর প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। এর মাঝে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করা যাবে। মীমাংসা সম্ভব হলে তালাক প্রত্যাহার করে নেবে। আর যদি ইদ্দত পার হয়ে যায় তবে প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে না। বিবাহ নবায়ন করতে হবে। অনুরূপ যদি তালাকে বায়েন উচ্চারণ করে তবে প্রত্যাহার করা যাবে না, নবায়ন করা যাবে। কিন্তু প্রথমেই যদি তিন তালাক উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে প্রত্যাহার বা মীমাংসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। নবায়নের সুযোগও থাকবে না।

দুই. তালাকের প্রকাশ :

অধ্যাদেশ ৭(১) ধারার এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, "তালাক উচ্চারণ করিলেই তাহা কার্যকর হয় না। ইহা দ্বারা কেবলমাত্র ইচ্ছা প্রকাশিত হয়।" (পিএলডি ১৯৭৬ লাহোর ১৯৬৬) শরীয়তের উচ্চারণ নীতি মতে যদি صيغه مستقبل (ফিউচার টেন্স) ব্যবহার করে তবে সেটা তালাকের ইচ্ছা বলে গণ্য হবে, তালাক কার্যকর হবে না। আর যদি حال (প্রেজেন্ট টেন্স) বা ماضى (পাস্ট টেন্স) এর শব্দ উচ্চারণ করে তবে সাথে সাথে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তালাকের ইচ্ছা আর তালাক উচ্চারণ এক কথা নয়। তালাক উচ্চারণ করে যদি বলে তালাক দিইনি ইচ্ছা করেছি মাত্র, তবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন কেহ গালির শব্দ উচ্চারণ করে যদি বলে আমি গালি দিইনি ইচ্ছা করেছি মাত্র, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, উচ্চারণের ব্যবধানের ভিত্তিতে তালাকের ইচ্ছা প্রকাশ আর তালাক প্রদানের মাঝে পার্থক্য হতে পারে। অধ্যাদেশে উচ্চারণের বিষয়টি ইসলামী আইনের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব ইসলামী আইন মতে, তালাকের ইচ্ছা প্রকাশের জন্য এভাবে চেয়ারম্যান নোটিশ তৈরি করতে হবে, আমি তালাকের ইচ্ছা করেছি/তালাক দিয়ে দেব/ছেড়ে দেব/তালাক দিতে চাই/বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই/ মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের তালাকের ব্যবস্থা করে দিন ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দ দ্বারা তালাকের ইচ্ছা প্রকাশ হবে, তালাক হবে না। পক্ষান্তরে যদি নোটিশ লিখে তালাক দিলাম/এক তালাক/দুই তালাক/তিন তালাক/বায়েন তালাক/ এটা ইচ্ছা প্রকাশ নয় বরং তালাক প্রদান হিসেবে গণ্য হয়ে কার্যকর হয়ে যাবে। ৭(২) ধারা মতে এমন ব্যক্তি সাজা পেতে পারে।

তিন. তালাক প্রত্যাহার :

উক্ত অধ্যাদেশের এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ৭(৩) ধারায় তালাক প্রত্যাহারের বিষয় উল্লেখ করা হইলেও কী পদ্ধতিতে উহা প্রত্যাহার করা হইবে, সে সম্পর্কে অধ্যাদেশে কিছু বলা হয় নাই। পিএলডি ১৯৭৭ লাহোর-এর ৩৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মামলায় লাহোর হাইকোর্ট অভিমত দেন যে তালাক উচ্চারণের মতো প্রত্যাহারও সাধারণ মুসলিম আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে। (পিএলডি ১৯৭৭-৩৬৩)

এখানে তালাক প্রত্যাহারের বিষয়টি ইসলামী আইনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর ইসলামী আইনে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ নেই। শুধু তালাকে রজঈ হলে ইদ্দতের মাঝে স্ত্রীকে রজআত করা যায়। বায়েন বা মুগাল্লাজ তালাক প্রত্যাহারযোগ্য নয়। অথচ অধ্যাদেশের ৭(৪) ধারায় চেয়ারম্যানকে সকল প্রকার তালাকের ক্ষেত্রে মীমাংসা করে তালাক প্রত্যাহার করানোর ক্ষমতা

দেওয়া হয়েছে। আবার স্বামীকে ৭(৩) ধারা মতে সকল তালাকের বেলায় ৯০ দিনের পূর্বে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অতএব এটা একই অধ্যাদেশের দ্বিমুখীনীতি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

চার. নোটিশ প্রদানের সময় :

যদিও অধ্যাদেশে তালাকের নোটিশ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এর খেলাফ করলে সাজার বিধানও রাখা হয়েছে; কিন্তু তালাক উচ্চারণের কত দিন পর চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করতে হবে সে সম্পর্কে অধ্যাদেশে কিছুই বলা হয়নি। অধ্যাদেশের এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে ".....তাহা ছাড়া আইনের বিধান পালনের জন্য নোটিশ যেই কোনো সময় প্রদান করা যাইতে পারে।" (পিএলডি ১৯৯৩ সুপ্রিম ৯০১)

নোটিশের সময় যেহেতু বেধে দেওয়া হয়নি কাজেই ৭(২) ধারা মতে নোটিশ না দিলে সাজার যে বিধান রাখা হয়েছে তা কার্যকর করার মতো আসামি পাওয়া মুশকিল হবে। কেননা বিপদাপদ দেখলে সাথে সাথে চেয়ারম্যানকে নোটিশ পাঠিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচার পথ বের করে নেবে।

উপসংহার :

মূলত তালাকের যাতনা থেকে নারী জাতিকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ নং ধারা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এর দ্বারা নারী জাতিকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তালাকের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপব্যবহার হচ্ছে তালাকের ক্ষমতা। এর জন্য দায়ী অধ্যাদেশের ধারাসমূহের দুর্বলতা।

যেহেতু অধ্যাদেশের ধারা মতে শত শত বার তালাক দিয়ে ৯০ দিনের পূর্বে প্রত্যাহার করার সুযোগ রাখা হয়েছে। তাই এই যাতনা থেকে নারী জাতি মুক্তি পাচ্ছে না।

যেহেতু অধ্যাদেশের ধারা মতে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিয়ে দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখা এবং মীমাংসার চেষ্টা না করার পথ খোলা রাখা হয়েছে তাই নারী জাতি মুক্তির পথ পাচ্ছে না।

যেহেতু চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার পর মীমাংসার পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে অধ্যাদেশ এ ব্যাপারে চুপ তাই মীমাংসার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে নারী জাতি সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

যেহেতু অধ্যাদেশের ধারা মতে চেয়ারম্যান উভয় পক্ষের প্রতিনিধি ছাড়াই সালিসি কাউন্সিল গঠনের ক্ষমতা রাখে তাই নারী জাতির স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা থাকে না। ফলে সালিসি ব্যবস্থার সুফল থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

যেহেতু অধ্যাদেশে নোটিশ না দিলে সাজার বিধান থাকলেও নোটিশের সময়সীমা বলা হয়নি তাই সাজা প্রয়োগের সুযোগ খুব কম ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। ফলে আইনের কোনো সহায়তা নারী জাতি পাবে না। যেহেতু অধ্যাদেশে অযথা অন্যায়ভাবে তালাক দিলে স্বামীর জন্য কোনো সাজার ব্যবস্থা রাখা হয়নি তাই তালাকের নির্যাতন থেকে নারী জাতি মুক্তি পাচ্ছে না। অতএব মানব রচিত এই আইনে মানবের কল্যাণ সম্ভব নয়। কোরআন-সুন্নাহ মতে এতে সংশোধনী আনা জরুরি।

আসল সমাধান :

পান থেকে চুন খসলে স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। উক্ত সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আইন করা হলো যে তালাক যতবারই দেওয়া হোক না কেন, এর দ্বারা এক তালাকের বেশি হবে না। অথচ এটা প্রকৃত সমাধান নয়। এখানে আসল সমস্যা হচ্ছে, ইসলামের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা। সমাজের উঁচু থেকে নিচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বলতে গেলে সকল শ্রেণীর মানুষ শরীয়তের ছোটখাটো এমন মাসআলার ব্যাপারেও অবগত নয়, যা একসময় সকল মুসলিম শিশুর জানা থাকত। তালাকের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের একটি ভুল ধারণা হলো, তিনের কমে তালাক দিলে তা কার্যকর হয় না। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে হলে তিন তালাকই দিতে হবে। তাই যখন তালাক দেয় একবারে তিনটিই দিয়ে ফেলে। উকিল-মোক্তারদের কাছে গেলেও তারা একবারে তিন তালাক লিখে দেয়। বিভিন্ন নোটারি পাবলিক বা কাজি অফিসের ফরমে তিন তালাক লেখা রয়েছে। কেউ তালাকের জন্য গেলে ওই ফরম পূরণ করে ফি আদায় করা হয়। অতএব আসল সমাধান হলো মানুষের এই ভুল ভাঙানো। একসাথে তিন তালাক প্রদান মারাত্মক গোনাহ। এক তালাক দিয়েই যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব, তিন তালাকের কী প্রয়োজন! তিন তালাক দিয়ে অনেক সময় আফসোস করতে হয়, অনুতাপ-পরিতাপে ভুগতে হয়। তাই এ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এভাবে যদি প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে সঠিক মাসআলা শেখানোর ব্যবস্থা করা যায় তবে এটা নিশ্চিত যে কেউ তিন তালাকের মতো সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নেবে না। তা ছাড়া এ বিষয়টি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকার চাইলে তিন তালাক প্রদানকারী বা তিন তালাকের লিপিকার, নোটারি পাবলিক, কাজি, উকিল-ব্যারিস্টারদের জন্য সাজার ব্যবস্থা রাখতে পারে। এভাবে ঘটা করে কয়েকজনকে শাস্তি দেওয়া হলে তিন তালাকের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। মূলত শরীয়ত কর্তৃক তিন তালাক

প্রদানকারীর জন্য যে সাজার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা হলো, যদি কেউ শরীয়তের নীতিমালা না মেনে তিন তালাক দেয় তবে ওই স্ত্রীকে সে আর বিয়ে করতে পারবে না। এটা কিন্তু কম বড় শাস্তি নয়। যাতে এই ভয়ে তিন তালাক না দেয়–এটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলো, শাস্তিকে ভয় করার জন্য এ বিষয়ে পূর্ব ধারণা থাকা আবশ্যক। অন্যথায় ভয় করবে কেন? অথচ বর্তমানে শাস্তির কথা জানতে পারছে তিন তালাক দিয়ে দেওয়ার পর। কাজেই সমস্যার আসল সমাধান হচ্ছে তালাকের প্রকৃত নিয়ম মানুষকে অবগত করা। এর জন্য দরকার ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা। সরকার চাইলে তার প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে কাজটি সহজেই করতে পারে। এবং ঘরে ঘরে দ্রুত পৌঁছে দিতে পারে। আজকাল পরিবার-পরিকল্পনাসংক্রান্ত কত ধরনের প্রচারণা চলছে। রাস্তায় রাস্তায় বিলবোর্ড, চিঠির খাম, দলিলের স্ট্যাম্প, বিভিন্ন ফরম, রেডিও, টেলিভিশনসহ কত রকমের মাধ্যম ব্যবহার করে এটা প্রচার করা হচ্ছে। ফলে ঘরে ঘরে এই কথা পৌঁছে গেছে। তালাকের অপব্যবহারের ফলে বহু পরিবার ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। তাই এসংক্রান্ত সঠিক মাসআলা প্রচারে বহুমুখী প্রচারণা চালানো যেতে পারে। এতে ঘরে ঘরে এর সুফল পাওয়া যাবে। তিন তালাক নিয়ে স্লোগান বানাতে হবে, 'একের অধিক তালাক নয়, তিন কথায় সাজা হয়।', 'তিন তালাক দেব না, জেলের ভাত খাব না' ও 'এক তালাকে কাজ হয়, তিন তালাকে পাপ হয়।' নারী জাতিকে তালাকের জুলুম থেকে মুক্তি দেওয়ার এটাই সঠিক পথ ও পন্থা। এর বিপরীত তিন তালাককে অস্বীকার করে এক হিসাব করে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনো মজলুমকে জালেমের হাতে লাঠিপেটা হতে দেখে লাঠি ছিনিয়ে না নিয়ে জালেমকে নিবৃত না করে বরং মজলুমকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে তুমি মার খেতে থাকো আমি এ কথা স্বীকারই করব না যে, কেউ তোমাকে লাঠিপেটা করেছে। বলুন তো এভাবে জুলুম বন্ধ করা কি কখনো সম্ভব হবে?

প্রস্তাবিত সংশোধনী :

ধারা ৭(১)

ক. দাম্পত্য কলহ মেটাতে প্রথমত স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান বের করার চেষ্টা করতে হবে। এতে কাজ না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য পৃথক বিছানায় একই ঘরে শোবে।

খ. ব্যক্তিগত চেষ্টা ব্যর্থ হলে তালাক উচ্চারণের পূর্বে সালিসের মাধ্যমে মীমাংসার নিমিত্তে উদ্ভূত পরিস্থিতি জানিয়ে আপস ও তালাকের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে চেয়ারম্যানকে লিখিত নোটিশ দিতে হবে এবং স্ত্রীকে তার একটি কপি পাঠাতে হবে।

ধারা-৭(২)

ক. কোনো ব্যক্তি ১ নং উপধারার বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে বিনা কারণে তালাকে রজঈ অথবা বায়েন উচ্চারণ করলে শরীয়তের বিধান মতে ওই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে এবং ওই তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে এরূপ তালাক প্রদানে কাজি, নোটারি পাবলিক বা অন্য কেউ সহযোগিতা করলে তাদেরকে জবাবদিহিতা করা হবে।

খ. কোনো ব্যক্তি ১ নং উপধারার বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে তিন তালাক উচ্চারণ করলে তিন বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং শরীয়তের বিধান মতে ওই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। এরূপ তালাক প্রদানে কাজি, নোটারি পাবলিক বা অন্য কেউ সহযোগিতা করলে সেই ব্যক্তিও সমান দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ধারা-৭(৩)

ক. ১ নং উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির পর সালিসের মাধ্যমে আপস করতে ব্যর্থ হলে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে চেয়ারম্যান এক তালাকে রজঈ প্রদান করবেন। উক্ত তালাকের ইদ্দত অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করা যাবে।

খ. ১ নং উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ পৌঁছার পর সালিসের অপেক্ষায় থাকাবস্থায় ৯০ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের পক্ষ থেকে তালাক কার্যকর করা যাবে না।

গ. উপধারা ৩(খ) লঙ্ঘন করে নিজেদের পক্ষ থেকে তালাক দিলে তা কার্যকর হয়ে যাবে। তবে ধারা-২ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধারা-৭(৪) ১ নং উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের ভেতর চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়ের পছন্দের একজন করে প্রতিনিধি ও একজন বিজ্ঞ মুফতীর সমন্বয়ে প্রয়োজনসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি সালিসি কাউন্সিল গঠন করবেন। এই কাউন্সিল পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপসরফার মাধ্যমে তালাক এড়ানোর নিমিত্তে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধারা-৭(৫) ৩ নং উপধারা অনুযায়ী তালাক প্রদানের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত রজঈ তালাক হলে স্ত্রীকে রজআত করা যাবে।

ধারা-৭(৬) একসাথে বা ভিন্ন ভিন্ন তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ না হলে তৃতীয় ব্যক্তির সাথে মধ্যবর্তীকালীন কোনো বিবাহ ব্যতীতই তার আগের স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহ কোনো প্রকার বাধা থাকবে না।

ভিন্ন চোখে কওমি মাদ্রাসা-১৪

মাওলানা কাসেম শরীফ

(সেপ্টেম্বর ২০১৭-এর পর)

শিক্ষা কী ও কেন?

বাংলা ভাষায় 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'শাস' ধাতু থেকে এসেছে । 'শাস' ধাতুর অর্থ 'শাসন করা', 'নিয়ন্ত্রণ করা' ইত্যাদি। আবার সাধারণভাবে শিক্ষা 'বিদ্যা অর্জন বা আহরণ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই বিদ্যা শব্দটি সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু হতে এসছে। এর অর্থ জানা বা জ্ঞান আহরণ করা। শিক্ষা বলতে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষণ ও প্রয়োগকরণ এ তিনের সমন্বয়কে বোঝায়। এ ছাড়া শিক্ষণ, পঠন ও লেখনে দক্ষতা অর্জন শিক্ষার অন্য পরিচয়। সামগ্রিকভাবে একজন মানুষের বিকশিত হতে যে অপরিহার্য হাতিয়ার প্রয়োজন, তা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Education. যার প্রতিটি অক্ষর বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার সামগ্রিক অর্থ ফুটে ওঠে।

The term EDUCATION stands for-

E-Enlargement of mind (মনের প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতার অবসান)

D-Discipline (শৃঙ্খলা)

U-Universal outlook (সর্বজনীনতা)

C-Characterization (নৈতিক চরিত্র গঠন)

A-Activities (শিক্ষার প্রয়োগ বা কর্মচাঞ্চল্য)

T-Truth worthiness (সত্যানুরাগ)

I-Idealism (আর্দশানুরাগ)

O-Omniscient (প্রজ্ঞার প্রকাশ)

N-Nice tempered (মেজাজের ভারসাম্য)

বিশ্লেষণটি পরখ করলে দেখা যায়, জীবনের সুকুমারবৃত্তিগুলোকে স্পর্শ করেছে শিক্ষা।

শিক্ষা নিয়ে মানুষের সচেতন চিন্তা-ভাবনার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার সর্বজনসম্মত কোনো সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকরা নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে শিক্ষার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন–দার্শনিক সক্রেটিসের মতে, 'শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।'

দার্শনিক প্লেটোর মতে, 'শিক্ষা হচ্ছে সেই শক্তি, যার দ্বারা সঠিক সময়ে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিবোধ জন্মায়। এটি শিক্ষার্থীর দেহে ও মনে সব সুন্দর ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করে তোলে।'

দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা দেহ-মনের সুষম এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের প্রকৃত মাধুর্য ও পরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।'

শিক্ষাবিদ কমেনিয়াসের মতে, 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।'

ফ্রেডারিক হার্বার্টের মতে, 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভার ও অনুরাগের সুষম প্রকাশ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।'

ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেলের মতে, 'সুন্দর, বিশ্বস্ত ও পবিত্র জীবন উপলব্ধি হলো শিক্ষা।'

দার্শনিক রাসেলের মতে, 'শিক্ষা হচ্ছে কতিপয় মানবিক গুণের যথা–সাহস, উদ্যম, অনুভীতিশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির বিকাশ সাধন।'

কান্টের মতে, 'আদর্শ মনুষ্যত্ব অর্জনই শিক্ষা।'

হার্বার্ট রিডের মতে, 'মানুষকে মানুষ করাই শিক্ষা। স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য সম্যক উপলব্ধি করতে যা সাহায্য করে, তা-ই শিক্ষা।'

শিক্ষা যা করে তাই-ই শিক্ষার কাজ। শিক্ষা কী করে? শিক্ষা মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে মনের চোখকে দেখতে সাহায্য করে। মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। আর এভাবে মানুষের আচরণকে পরিশীলিত করে। মানুষকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই জ্ঞানের আলো হৃদয়ে জ্বালানোই শিক্ষার কাজ। যেমন–যে জীবন-দর্শন মানবজাতিকে পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে এবং যে জীবনদর্শনের শিক্ষা মানুষকে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে একটি মনোনীত শ্রেণী দ্বারা আর সব শ্রেণীকে নির্মূল করে দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের পাঠ দেয়, সে জীবন-দর্শনের শিক্ষা মানুষের মনে যে ঈর্ষা ও ঘৃণার আলো জ্বালাবে, ভালোবাসার নয়, তাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এজাতীয় জীবন-দর্শন ঘৃণার দর্শন, প্রেমের দর্শন নয়। এজাতীয় জীবন-দর্শন 'মনুষ্যত্বকে' ধ্বংস করে দিয়ে মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোর আলো জ্বালাতে থাকে। তখন মানুষ পশু বা তার চেয়েও নিম্নমানের বা নিষ্ঠুর আচরণ অনায়াসে করতে পারে। অন্যদিকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে, আত্মীয়, মিসকিন ও মুসাফিরদের অধিকার আদায় করতে হবে। ইংরেজিতে Tax, Charity এবং Rights এই তিনটি শব্দের আভিধানিক ও ব্যবহারিক ব্যবধান বিস্তর। পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ জীবন-দর্শন এবং বস্তুবাদী শ্রেণীসংগ্রামের জীবন-দর্শনের শিক্ষায় আত্মীয়, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য কোনো 'অধিকার বা Rights বলে কিছু নেই। সেখানে Charity বা দয়া-দাক্ষিণ্য আছে, তবে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তির খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভরশীল এবং তা ইসলামের বিধানের মতো এত সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ বা ক্লাসিফায়েড নয়। আর এ কারণেই পাশ্চাত্যে কুকুর-বিড়ালকেও উইল করে সম্পত্তি দেওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে; তেমনি অর্ধাহারে-অনাহারে মানুষের দিন গুজরানের দৃষ্টান্তও আছে। অন্যদিকে ইসলামে বিষয়টি শুধু Charity বা

দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, এটা আত্মীয় মিসকিন ও মুসাফিরের অধিকার। আর ধনী ব্যক্তিদের এ অধিকার আদায় করতে বলা হয়েছে। বিষয়টা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করতে হবে। অন্যথায় অবশ্যই জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। জবাবদিহিমূলকভাবে জীবন গড়াই মানবজাতির প্রতি ইসলামের শিক্ষার অ্যাপ্রোচ। যাতে করে প্রকৃত জবাবদিহির দিন তা সহজ হয়। পৃথিবীতেও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষ সুখী হয়। ধনী, দরিদ্র, আত্মীয়, মিসকিন, মুসাফির, ধর্ম-বর্ণ-রক্ত-জাত-পাত নির্বিশেষে জনে জনে মমত্ববোধ ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্বকে স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করেছে; তবে তাদের মাঝে সংগ্রাম বা ঘৃণার অস্তিত্ব স্বীকার করেনি বরং তাদের মাঝে পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের জীবন-দর্শন তাই ঘৃণার নয়, প্রেমের, একের প্রতি অন্যের দায়িত্বশীলতার। জনে জনে মমত্ববোধ ছড়িয়ে দেওয়াই ইসলামে শিক্ষার কাজ। (সূত্র : শিক্ষা ও নৈতিকতা, শেখ মোহম্মদ শোয়েব নাজির)

শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের অবদান

ইকরা–এই নির্দেশই ছিল ইসলামের প্রথম শিক্ষা। ইকরা মানে পড়ুন, পাঠ করুন, উপলব্ধি করুন।

শিক্ষার এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে অমূল্য অবদান রেখে গেছে। একদল প্রথিতযশা ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানমনস্ক গবেষক ও তথ্য উদ্ঘাটক (যেমন : জন উইলিয়াম ড্র্যাপার, গুইজট, জন ডেভেনপোর্ট, স্টেনলি লেন-পুল, এমপিই বার্থেলট ও অতি উৎসাহী এবং নিবেদিত আধুনিককালের ই জে হোইয়ার্ড ম্যাঙ্গ মেয়ারহফ, জর্জ সার্টন এবং ফিলিপ কে হিট্টি) সম্পূর্ণভাবে এই ঐকমত্যে পৌঁছেন এবং স্বীকার করেছেন যে 'মুসলিম আরবরা শুধু প্রাচীন গ্রিক, পারসিক ও ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থাই করেননি, বহুলাংশে সেসবের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।'

অষ্টম শতাব্দীর গোড়া থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মুসলিমরা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের দক্ষতা অর্জনে অত্যন্ত সন্ধিৎসু জাতি। তারা শুধু নিজেরাই জ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনে নিরত ছিল না, বরং জ্ঞানান্বেষু অন্যান্য জাতিকে তাদের অধিত জ্ঞানের অংশীদার করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা জ্ঞান সাধনার পাশাপাশি ধর্মপ্রচারক ও সমরনায়কদের সঙ্গে বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছেন। মুসলিমদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এভাবেই বন্য দ্যালামাইতস, স্যালজুক, তাতারস ও বার্বার জাতি শান্তির সন্ধান খুঁজে পেয়েছে। তবে মুসলিম সভ্যতার জন্য ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল চেঙ্গিস খান, হালাকু খান নামে মানবতার শত্রুরা। মামলুক সুলতানদের দ্বারা এসব মানবতার শত্রুরা প্রতিহত না হওয়া পর্যন্ত এরা মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্জন ও কৃতিগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে যাচ্ছিল।

মিসর ও সিরিয়া চিরদিনই সালাহ আল দীন (জন্ম তাকরিত ১১৩৮, মৃত্যু মার্চ ১১৯৩) রোকন আল দীন বাবর (১২৬০-৭৭) এবং সাইফ আল দীন কালাউন (১২৭৯-৯০) প্রমুখের জন্য গৌরবান্বিত বোধ করবে। এরা যে শুধু ক্রুসেডেই গৌরবময় ভূমিকা রেখেছিল তা নয়, বরং জ্ঞান সাধনা, ইসলামের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও আনুগত্য, সুকুমার শিল্পকলা, স্থাপত্য শিল্প, হাসপাতাল স্থাপন এবং খালখনন প্রভৃতি শিক্ষা ও জনহিতকর কার্যক্রমের জন্য যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আরব থেকে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি কিভাবে ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করেছে, সে ইতিহাস সত্যিই চমকপ্রদ। মূলত সিসিলি ও স্কেন ছিল এসব বিস্তৃতির প্রধান উৎসস্থল। সিসিলির ছিল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত দুজন শাসক। তাঁরা হলেন রজার দ্বিতীয় এবং ফ্রেডরিক দ্বিতীয়। এ ছাড়া ছিলেন হোহেনস্টফেন, বিশেষত শেষোক্তজন আল্পস পর্বতমালা অতিক্রম করে আরবের মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে আসে ইউরোপে এবং লোথারিঞ্জিয়া [Lotharingia (Lorraine)], লাইজি [Liege], জর্জি [Gorge] এবং কোলন [Cologne] এই স্থানগুলো ক্রমে আরব থেকে আনীত মুসলিমদের জ্ঞানের লালন কেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করে। স্পেন থেকে এই জ্ঞান পিরিনিস [Pzrenees] ডিঙিয়ে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মুসলিমরা যখন একপর্যায়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কর্মকাণ্ডে স্থিত হয়ে যায়, খ্রিস্টীয় ইউরোপ তখন চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রমেই অগ্রসরমান। বিশেষ করে কর্ডোভা, টলেডো, সেভিল এবং গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা দেশে ফেরত আসার পর বর্ণিত বিষয় ও ক্ষেত্রগুলো শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতি লাভ করতে থাকে। বিস্ময়করভাবে মুসলিমদের জ্ঞান তখন পরিশ্রমী অনুবাদকদের দ্বারা অনূদিত হয়ে ইউরোপে স্থানান্তরিত হতে থাকে। এসব অনুবাদকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান হয়ে আছেন, জেরার্ড অব ক্রেমোনা, অ্যাডেলার্ড অব বাথ, রবার্ট অব চেস্টার, মাইকেল স্কট, স্টিফেন অব সারাগোসা, ইউলিয়াম অব লিউনিস, ফিলিপ অব ত্রিপোলি। অনুবাদের মাধ্যমে লাতিন জনগণের মধ্যে ওই অনুবাদকরা মুসলিম আরবদের জ্ঞান সহজলভ্য করে তোলে। কিছু বই হিব্রু ভাষায়ও অনূদিত হয়। অন্যদিকে কিছুসংখ্যক হিব্রু ও লাতিন গ্রন্থ ইউরোপের নিজস্ব ভাষায়ও অনূদিত হয়। ইউরোপের স্যালার্নোতে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু হয়।

আফ্রিকার অধিবাসী কনস্টানটাইন চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখার জন্য সৌভাগ্যক্রমে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে একজন আরবকে পেয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। মন্টপেলিয়ার ও প্যারিস শিগগিরই এই ধারা অনুসরণ করে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। তখনকার দিনে আরবি ভাষাই ছিল বলতে গেলে সমগ্র বিশ্বের বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলগুলোতে

আরবি ভাষায়ই পড়ানো শুরু হলো। বিশেষত টলেডো, নারবোনে, নেপলস, বোলোনা ও প্যারিস প্রভৃতি শহরে আরবি ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে পড়াশোনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল স্থাপন করে।

নির্ভরযোগ্য লেখক ও গবেষকদের মতে, মুসলিম স্পেন থেকে ফ্রান্স ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলো এবং মুসলিম অধ্যুষিত সিসিলি থেকে ইতালিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ বিস্তৃতি লাভ করে। স্পেনের মুসলিম শাসক কর্তৃক সে সময়ে যে সেচ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং তাঁদের উদ্যানবিদ্যা তথা কৃষি-বনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তাতে অচিরেই দেশকে শাক-সবজি ও কৃষিজাত ফসলে স্বনির্ভর এবং সবুজাভ স্পেনে রূপান্তরিত করে। মুসলিমদের এসব গৌরবময় অতীতের ঘটনাবহুল ইতিহাস ও ঐতিহ্যময় কর্মকাণ্ডের কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে আবু যাকারিয়া ইবন মুহাম্মাদ আল-আওয়াম ইশবিলি বিরচিত 'কিতাব আল-ফলাহাত' গ্রন্থে। আবু যাকারিয়া বিরচিত গ্রন্থে ন্যূনপক্ষে ৫৮৫টি প্রজাতির উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটি লেখায় উদ্ভিদগুলো রোপণ ও নার্সিং করার সুস্পষ্ট নিয়মাবলি সুগ্রন্থিত।

জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে মুসলিমদের পারদর্শিতা ছিল না। দার্শনিক আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবন সিনা ও ইবন রুশদ সমসাময়িককালের 'জ্ঞান ভাণ্ডার' নামে পরিচিত হতেন। আল-কিন্দি চক্ষুরোগ, রসায়ন, চিকিৎসা ও দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইবন সিনা মাত্র ১৮ বছর বয়সে চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে দুটি বিশ্বকোষ ইবন সিনা রচনা করেছিলেন সেসব দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চিকিৎসা জগতে পথপ্রদর্শক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তাঁর বইগুলো ১৬ বার পুনর্মুদ্রিত হয়।

রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সব বিষয়ই মুসলিম গবেষক ও বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট দখল ছিল। আল-খাওয়ারিযি্ম, মুসা বিন সাকির, আলবিরুনি, ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসী, মাসুদী, আত-তাবারি, ইবনে খলদুন–এমন আরো শত শত বিজ্ঞানী ও জ্ঞানতাপস যুগে যুগে জ্ঞান চর্চা করে বিশ্বকে যে আলোকবর্তিকা হাতে দিয়ে গেছেন, তা আজও তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে অমূল্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত। মুসলিমদের জ্ঞানচর্চা চলছিল ৫০০ বছর, আর এই সময়ই ছিল ইউরোপের ইতিহাসের অন্ধকারতম যুগ। একই সময় ভারতবর্ষ অবনত ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণাত্যের অধীন, যা বৌদ্ধধর্মকে বিধ্বস্ত কিংবা বিকৃত করেছিল।

মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালাবার নির্দেশ 'ইকরা' দিয়ে শুরু হয়েছিল ইসলামের শিক্ষার সূচনা। তা শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে মানব সভ্যতাকে আলো বিতরণ করে গেছে, কোনো ধরনের মানবিক বিকৃতি ছাড়াই। মানুষকে কোনো বস্তু বা প্রাকৃতিক কোনো শক্তির দাসত্বে পরিণত করেনি। মানুষকে যন্ত্র বলে উল্লেখ করেনি, যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শন করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব বিষয়ে গভীর বিস্তৃতি সত্ত্বেও মানুষের যে মর্যাদা আল্লাহ দান করেছিলেন, তা অক্ষুণ্ন ছিল। মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদতকারী অনুগত বান্দা হয়ে তাঁর অন্য সব সৃষ্টির ওপর মর্যাদাবান হয়েই ছিল। আল্লাহ সব সৃষ্টির মধ্যে শুধু মানুষই শিক্ষার মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন করতে পারে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে এবং প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে এনে কাজে লাগাতে পারে। মানুষের এই অনন্য গুণ তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদায় আসীন করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে দেহ ও মন উভয়টি নিয়েই মানুষ। সুতরাং যে শিক্ষা মানুষের দেহ ও মন উভয়টির বিকাশ সাধন করে, স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটায়, নৈতিকতা ও মাধুর্য বৃদ্ধি করে, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নতি সাধন করে ও আল্লাহর সৃষ্টিকে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করে তা-ই ইসলামী শিক্ষা। আমরা যেটাকে সাধারণ শিক্ষা বলে অভিহিত করি, তার মধ্যে যদি আল্লাহর কুদরতের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেটাকে মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা হয় তাহলে তাও ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের সোনালি যুগে সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা নামে শিক্ষার বিপরীতমুখী দুটি প্রকরণ ছিল না, বরং যাঁরাই কোরআন ও হাদিসের চর্চা করতেন, তাঁরাই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা করেছেন। ইবন রুশদ, ইমাম রাজি, গাযালি প্রমুখ মনীষী এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মুসলিম বিশ্ব যখন সাম্রাজ্যবাদের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, তখন সাম্রাজ্যবাদী চক্র ইসলামী চেতনার শিক্ষার ধারাকে গুরুত্বহীন করার লক্ষ্যে মুসলিমদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা নামে দুটি ধারা তৈরি করে দিয়ে যায়; যার সুদূরপ্রসারী ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই–মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমরা আজ ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ইসলাম জ্ঞানকে এভাবে কখনোই বিভক্ত করেনি। জ্ঞান মুসলিমদের হারানো সম্পদ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশি অধিকারী।'

হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানকে সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা নামে কোনো বিভেদ করেননি। তাই বোঝা যায়, মানুষের কল্যাণে যে জ্ঞানই উপকারী হয়, সবই ইসলামী শিক্ষা। বিশুদ্ধ নিয়তে, আল্লাহর নামে পাঠ করা হলে যেকোনো ধরনের জ্ঞান অর্জনই ইবাদত বলে গণ্য হবে।

[সূত্র : সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (ঈষৎ পরিবর্তিত)]

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাও. আব্দুল্লাহ

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

অনেকেই দাবি করেন যে মসজিদের ভূমিকা তো অতীতে অনেক ছিল তথা নামায-কালাম, দরবার-সালিস, বিচার-আচার, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ শিক্ষা-দীক্ষা তাবলীগের কাজ নির্দ্বিধায় করা হতো। বর্তমানে এসব কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে চাইলে ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো বাধা-বিপত্তি আছে কি না? হযরতের নিকট উক্ত বিষয়ের সঠিক সমাধান কামনা করছি।

সমাধান :

অতীতের ন্যায় বর্তমানেও সুশৃঙ্খলভাবে মসজিদের সম্মান বজায় রেখে দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা, তাবলীগসহ সর্বপ্রকার দ্বীনি কার্যক্রম আঞ্জাম দেওয়া যাবে। তবে বর্তমানে যেহেতু শরয়ী বিচার-আচার নেই। বরং এসব বিচার-আচারে শোর হাঙ্গামা গালি-গালাজ হওয়াটাই সাধারণ বিষয়। যদ্দরুন এসব কার্যক্রম মসজিদে পরিচালনা করা হলে মসজিদের যথাযথ সম্মান রক্ষা হবে না। বিধায় মসজিদে প্রচলিত সালিস-দরবার, বিচার-আচার, রাজনৈতিক কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করা জায়েয হবে না। (আল-বাহরুর রায়েক-৬/৪৬৭, হাশিয়ায়ে তাহতাবী-৩/১৮২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-২/৪৭৩)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাও. আব্দুল্লাহ

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে মুসলিমদের ইবাদতখানা মসজিদে কোনো অমুসলিম, শালীনতা ও পাকসাফ হয়ে যদি আসতে চায় তাহলে মুসল্লি-মুতাওয়াল্লি ইসাম সাহেব তাকে বাধা দেবেন? না সাদরে তাকে মসজিদে আসতে দেওয়া যাবে? বিষয়টির সঠিক সমাধান শরীয়তের দৃষ্টিতে কী? জানালে খুশি হব।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে মুসল্লি, মুতাওয়াল্লি, ইমাম তাকে বাধা না দিয়ে সাদরে গ্রহণ করবেন এবং তার সাথে উত্তম-আচরণ করে হেকমতের ভাষায় দ্বীনের দাওয়াত দেবেন। (সূরা তাওবা-২৮, হিদায়াহ-৪/৪৭৪, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-১৪/১৯০)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহাম্মদ শাহ নেওয়াজ

উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার ১৩ শতাংশ জমি মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। ওই জমির কিছু অংশের মধ্যে কবরস্থান ছিল পূর্ব থেকেই। এখন জানার বিষয় হলো, মসজিদের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত জমির মধ্যে কবরস্থানের জন্য কিছু অংশ আলাদা করা যাবে কি না? এবং এর কিছু অংশে মাদরাসা করা যাবে কি না? জানিয়ে উপকৃত করবেন।

বি.দ্র.: হুজুর, আমাদের পারিবারিক কবরস্থানের জন্য আর কোনো জায়গা নেই।

সমাধান :

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা শরীয়তের বিধান। সুতরাং প্রশ্নোক্ত জমি থেকে কবরস্থানের জন্য বা মাদরাসার জন্য সামান্য জায়গাও পৃথক করা জায়েয হবে না। তবে উল্লিখিত কবরস্থানটি পূর্ব থেকে ওয়াক্ফিয়া হয়ে থাকলে তা কবরস্থানের জন্যই থেকে যাবে। অবশিষ্টাংশ মসজিদের কাজে ব্যবহৃত হবে। আর ওয়াক্ফিয়া না হলে কবরগুলো পুরাতন হওয়ার পর মাটির সাথে মিশিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। উল্লেখ্য, এলাকার পাবলিক কবরস্থান থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক কবরস্থানের জন্য চিন্তার প্রয়োজন নেই। (আদ-দুররুল মুখতার-৪/৩৫৫, ফাতাওয়ায়ে শামী-৪/৩৫৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-২/৪৯০)

প্রসঙ্গ : আকীদা-বিশ্বাস

মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ

বনানী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১. যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে রাসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি আলমে বরযখে জীবিত আছেন তাহলে তার আকীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত অনুযায়ী সঠিক কি না?

২. বাংলাদেশে যেভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী পালিত হয় তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস অনুযায়ী সঠিক কি না?

সমাধান-১ :

প্রশ্নোক্ত আকীদাটি শরীয়তসম্মত এবং এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। (সূরা আলে ইমরান-১৪৪, সূরা ঝুমার-৩১, মুসনাদে আহমদ-১২/৪৭৫,

সমাধান-২ :
প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী শরীয়তসম্মত নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুযায়ী তা বিদ'আত। (বোখারী শরীফ-২/২৪৪, ফতহুল বারী-১৩/২৬৬, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া-১১৫)

প্রসঙ্গ : তাহাজ্জুদ
মাও. মিজানুর রহমান
বদরগঞ্জ, রংপুর।
জিজ্ঞাসা :
এলাকাবাসীর আগ্রহকে সামনে রেখে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য আযান বা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করার শরীয়তে অবকাশ আছে কি না? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।
সমাধান :
বর্তমানে তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী, তবে যারা তাহাজ্জুদ পড়তে ইচ্ছুক তারা নিজ ঘড়ি বা মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থা যেমন–মাইকে সাইরেন বা ঘণ্টা ইত্যাদি বাজানোর দ্বারা যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তি ও অন্যান্যদের কষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে তাই এ পন্থা থেকে বিরত থাকা উচিত। (শরহুল মাআনিল আছার-১/১০৬, রদ্দুল মুহতার-৬/৩৯৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/৫৩)

প্রসঙ্গ : মসজিদ
মাও. আব্দুল্লাহ
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।
জিজ্ঞাসা :
মসজিদ শুধু ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্ধারিত? না সেখানে পাঠাগার, স্কুল, কলেজ-ভার্সিটি তৈরি করে সেখানে অবাধে নারী-পুরুষ শিক্ষার জন্য আসতে পারবে? বিষয়টি নিয়ে অনেকেই বাড়াবাড়ি করছে। হযরতের নিকট নিবেদন এই যে কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করবেন।
সমাধান :
মসজিদ শুধুমাত্র ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্ধারিত। সেখানে দুনিয়াবী কাজকর্ম বা জাগতিক কোনো শিক্ষা প্রদান করা নাজায়েয। বিশেষ করে অবাধে নারী-পুরুষের সহশিক্ষার জন্য তা ব্যবহার করা মারাত্মক গোনাহের কাজ। শরীয়তে একেবারেই এর অনুমতি নেই। (সূরা জিন-১৮, আল-বাহরুর রায়েক-৫/২৫১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-২/৪৬২)

প্রসঙ্গ : মিরাছ
সুমাইয়া আক্তার
কিশোরগঞ্জ।
জিজ্ঞাসা :
আমরা দুই ভাই ও দুই বোন। আমাদের পিতা ১২ বিঘা জমি রেখে অনেক আগে ইন্তেকাল করেন। আজ পর্যন্ত আমাদের ভাইয়েরা আমাদের (বোনদের) প্রাপ্ত অংশ দিচ্ছে না। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের শাস্তির বিধান কী এবং আমরা কী উপায় অবলম্বন করলে আমাদের সম্পদ ফিরে পেতে পারি, জানালে উপকৃত হব।
সমাধান :
পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে বোনদের অংশ তাদেরকে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেওয়া জমি আত্মসাৎ করার নামান্তর। আখিরাতে এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারীর নেকী জমির মালিককে দিয়ে দেওয়া হবে। হিসাব পুরো না হলে জমির মালিকের গোনাহ আত্মসাৎকারীকে দেওয়া হবে। এক হাদীসে আছে, যে কাউকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন। অন্য হাদীসে আছে, যে অন্য কারো এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করবে তাহলে সাত তবক জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় আইনেও এটা মারাত্মক অন্যায় ও দণ্ডনীয় অপরাধ। অতএব আইনের আশ্রয় নিয়ে বা অন্য কোনো বৈধ পন্থায় আপনি আপনার প্রাপ্ত অধিকার উসূলের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। (সূরা নিসা-২৯, বোখারী শরীফ-১/৩৩২, ইবনে মাজাহ শরীফ-৪৯০)

প্রসঙ্গ : নামায
মাও. আব্দুল কাদের
কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
জিজ্ঞাসা :
আমাদের এলাকার জামে মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দান ছোট। তাই জুমু'আর দিন ও ঈদের দিন মুসল্লি বেশি হওয়ার কারণে একসাথে একই ইমামের পেছনে সকলেই নামায আদায় করা সম্ভব হয় না। তাই বাধ্য হয়ে ঈদ ও জুমু'আর দুই জামাত করতে হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো,
১. মসজিদ বা ঈদগাহ ময়দান ছোট হওয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে একই স্থানে জুমু'আ বা ঈদের নামায দুইবার আদায় করা যাবে কি না?
২. ঈদ বা জুমু'আর নামাযের নিজ এলাকার জামাত যদি ছোট হয় আর অন্য এলাকার জামাত যদি বড় হয় তাহলে অন্য এলাকার বড় জামাতের সাথে ঈদ বা জুমু'আর নামায আদায় করা উত্তম, না নিজ এলাকার ছোট জামাতের সাথে আদায় করা উত্তম?
সমাধান-১ :
জুমু'আ মসজিদে দুইবার জুমু'আর

নামাযের জামাত করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ নয়। মসজিদ ছোট হওয়ার কারণে যদি সকলে এক সঙ্গে জুমু'আর নামায আদায় করতে না পারে তাহলে নিকটতম কোনো মসজিদে বা অন্য কোনো মাঠে জুমু'আর নামায আদায় করবে। আর ঈদগাহে মানুষ সংকুলান না হওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার ঈদের জামাত করা বৈধ হবে। সর্বাস্থায় মসজিদ ও ঈদগাহ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া এলাকাবাসীর কর্তব্য। (আদ-দুররুল মুখতার-১/৫৫২, ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়া-৯/২৭৩)

সমাধান-২ :

নিজ এলাকার মসজিদ ও ঈদগাহ ছোট হলেও তাতে নামায আদায় করা উত্তম। (ইবনে মাজাহ শরীফ-২৪৯, ইমদাদুল মুখতার-১/৬৫৯)

প্রসঙ্গ : দাড়ি

মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ
লালবাগ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

দাড়ি রাখার হুকুম কী? সুন্নাত না ওয়াজিব এবং এর পরিমাণ কী? এক মুষ্টি না এর কম হলেও চলবে? এবং চোয়ালের ওপর যে দাড়ি থাকে তা কাটা যাবে কি না?

সমাধান :

দাড়ি রাখা সর্ব সম্মতিক্রমে ওয়াজিব এবং তার পরিমাণ হলো কমপক্ষে এক মুষ্টি। দাড়ি এক মুষ্টির অধিক হলে মুষ্টি থেকে অতিরিক্ত যা হবে তা কাটার অনুমতি আছে, কিন্তু মুষ্টির ভেতরে কাটা হারাম ও কবিরা গোনাহ। চোয়ালে উদগত সকল পশমও দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। (বোখারী শরীফ-৭৩৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/২২৪, আল-বাহরুর রায়েক-১/২৪)

প্রসঙ্গ : নামায

মাও. আব্দুল্লাহ
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

ক. আমাদের এলাকায় কিছু লোকের পক্ষ হতে দাবি এসেছে যে আযান, ইকামত, নামায, জানাযাসহ মৌলিক ইবাদতগুলো আরবীর পরিবর্তে মাতৃভাষা বাংলাতে আদায় করতে হবে। এ মর্মে তারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর এই উক্তিটি "ফার্সি ভাষায় নামায পড়া যাবে" প্রমাণস্বরূপ পেশ করে থাকে, এবং না বুঝে পড়া নাকি অন্ধ অনুকরণ এবং এভাবে ধর্ম-কর্ম করা আমাদের ইহজীবনে সুখ-শান্তি কল্যাণ বয়ে আনে না, পরকালেও আনবে না। হযরতের সমীপে আমার প্রশ্ন হলো, তাদের দাবি কতটুকু সঠিক?

খ. অর্থ বুঝে নামায পড়া জরুরি কি না? এবং অর্থ না বুঝে নামায পড়লে নামায হবে কি না? এ বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে উপকৃত করবেন।

সমাধান-ক :

কোরআন-সুন্নাহর আকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্ট যে অনুসৃত রূপরেখায় নববী যুগ থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত উম্মতে মুসলিমাহ ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ পালন করে আসছে তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করাও গোমরাহী ও বদদ্বীনি বৈ কিছু নয়। বরং এ ধরনের নব আবিষ্কৃত মত ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের চক্রান্তের ফসল। সুতরাং আযান, ইকামত, নামায ও জানাযা ইত্যাদি বাংলা ভাষায় আদায় করা সংক্রান্ত তাদের এ দাবি সঠিক নয়। এ ব্যাপারে ইমামে আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর উপরোক্ত উক্তিটি দলিল হিসেবে পেশ করা আরো দুঃখজনক। কারণ তা থেকে তিনি রুজু করেছেন। আর মুজতাহিদ যে মত থেকে রুজু করেন তা রহিত হিসেবে গণ্য হয়। সেটাকে তাঁর মত হিসেবে পেশ করা বা তদানুযায়ী আমল করা কোনোটিই বৈধ নয়। (সূরা নিসা-১১৫, মুসলিম শরীফ-৩৭৯, মারাকিল ফালাহ-১৯৬)

সমাধান-খ :

কোরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্য ও ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে নামায সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ তিলাওয়াতই যথেষ্ট, অর্থ বোঝা জরুরি নয়। (আহকামুল কোরআন-৩/৭০২, বোখারী শরীফ-৭৯৩, কিফায়াতুল মুফতী-২/৫২০)

প্রসঙ্গ : কোরআন শিক্ষা

মাও. সিদ্দিক আহমদ
বড়ইতলী ফয়জুল উলূম মাদরাসা।

জিজ্ঞাসা :

আমরা জানি যে কোরআন শরীফ শিক্ষা করা এবং সহীহ-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা উভয়টিই ফরযে আইন। অথচ বর্তমানে হাজার হাজার মুসলমান দুনিয়ার সব কাজ করতে প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও কোরআন শরীফ শিখতে তারা প্রস্তুত নয়। তাদেরকে শিখতে বললে বলে যে, "আমার সময় নাই" যার দ্বারা বোঝা যায় যে, তারা অবজ্ঞা করতেছে। কোরআন শিক্ষা করা যে ফরয, তা তারা স্বীকার করতেছে না। আমার প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় যারা কোরআন শরীফ শিখতেছে না বা সহীহ-শুদ্ধ করে শিখছে না তাদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

সমাধান :

পুরো কোরআন শরীফ শিক্ষা করা ফরযে আইন নয়। বরং সুন্নাতে আইন ও ফরযে কেফায়া। হ্যাঁ, যে পরিমাণ কেরাত নামাযে ফরয সে পরিমাণ সহীহ-শুদ্ধভাবে মুখস্থ করা প্রত্যেকের

ওপর ফরয। আর যে পরিমাণ নামাযে ওয়াজিব সে পরিমাণ ওয়াজিব। এর জন্য সামাজিকভাবে বাধ্য করা সমাজপতিদের ঈমানী দায়িত্ব। এ পরিমাণ শিখতে অবহেলা করা হারাম। এর অপরিহার্যতা অস্বীকার করলে ঈমানহারা হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তবে প্রত্যেক অবহেলাকে ঢালাওভাবে অস্বীকার বা অবজ্ঞা বলা যায় না। (দুররুল মুখতার-১/৫৩৭, শরহুল আকাইদ-২৭৭)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহাম্মদ বাদল আলী খান

জিজ্ঞাসা :

একজন মহিলা তার স্বামীর সাথে ২৮ বছর সংসার করার পর প্রেম করে তার ছোট দেবরের সঙ্গে গোপনে কোর্ট ম্যারেজ করে পালিয়ে গিয়ে ৩-৪ দিন বাসা ভাড়া করে ছিল। পরবর্তীতে মহিলার ভাই, মা, স্বামী, ছেলেমেয়ে ও অভিভাবকদের দিকে তাকিয়ে (পরের স্বামী) দেবরকে তার অজান্তে রেজিঃ অফিসে গিয়ে কাজি অফিসে তালাক দেয় এবং প্রথম স্বামীর বাড়িতে ১ মাস থাকে। স্বামী তখন ঢাকায় ছিল, ১ মাস পর আবারও উক্ত দেবরের সাথে পালিয়ে যায় এবং নতুন বিবাহ ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর মতো ২ মাস সংসার করার পর বাপের বাড়িতে চলে আসে।

জানার বিষয় ঃ ১. প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় সংসার করতে হলে ইসলামিক শরীয়ত অনুযায়ী করণীয় কী?

২. তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের করণীয় কী? সমাধান প্রয়োজন।

সমাধান :

প্রশ্নোক্ত মহিলার প্রথম স্বামীই তার স্বামী হিসেবে বহাল আছে, আর সে তার দেবরের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে কৃত গোনাহের জন্য কায়মনোবাক্যে তাওবা-এস্তেগফার করবে। মহিলার স্বামী ও অভিভাবকদের জন্য কর্তব্য হলো, পরিপূর্ণভাবে তাকে শরয়ী পর্দায় রাখা এবং তাকে কড়া নজরদারি করা। যাতে সে ভবিষ্যতে এমন ন্যক্কারজনক অপকর্মের প্রয়াস চলাতে না পারে। (রদ্দুল মুহতার-৩/৫০৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৮০, কিতাবুন নাওয়ায়েল-৮/২৩৬)

প্রসঙ্গ : পীর-মুরিদী

মাও. শরিফুল ইসলাম

বসুন্ধরা, আ/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

পীরকে পীর সাহেব না বলে হুজুর কেবলা বলা যাবে কি না? আর যদি পীর মুরিদদেরকে বলতে বাধ্য করে তাহলে সে পীরের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

সমাধান :

পীর সাহেবকে হুজুর কেবলা প্রকৃত অর্থে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা বা বলা মাকরূহ। তবে এজাতীয় শব্দ রূপক অর্থে নিছক সম্মানার্থে মুহাববতের বহিঃপ্রকাশের লক্ষ্যে বলা জায়েয হলেও বাহ্যিকভাবে তা প্রকৃত অর্থে হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই হুজুর কেবলা বা এজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা বা বলা হতে বিরত থাকা উচিত। আর কোনো হক্কানি পীর মুরিদকে হুজুর কেবলা বলতে বাধ্য করতে পারে না। (বোখারী শরীফ-৩৪৪৫, ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া-৫২২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/২৭৪)

প্রসঙ্গ : মহিলা মসজিদ

মাও. আব্দুল্লাহ আল মামুন

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকার অনেক লোকই মনে করে রাসূল (সা.)-এর যুগে মহিলারা অবাধে মসজিদে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারত। বর্তমানে কেন মহিলাদের মসজিদে গিয়ে ইবাদত করতে নিষেধ করা হচ্ছে? এমনকি মসজিদে তাদের কোনো স্থান তৈরি করা হয় না এবং তাদের মসজিদে আসাটাই দোষ মনে করা হয়, বিষয়টা নিয়ে এলাকাতে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মুফতী মহোদয়ের নিকট আবেদন এই যে, উক্ত বিষয়টির সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

সামাধান :

মহিলাদের জন্য জুমু'আ বা জামাতে শরীক হওয়ার বিধান শরীয়তে রাখা হয়নি, মহিলারা একাকী নিজ গৃহের অন্দরমহলে নামায আদায় করবে–এটাই নবীজি (সা.)-এর শিক্ষা। সরাসরি নবীজি (সা.)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে উলূমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মসজিদে নববীতে মহিলাদের আগমন হতো, তৎকালীন মদীনা শরীফে অন্য কোনো মসজিদে এমন হতো না। তাই ওই যুগে অবাধে মহিলাদের মসজিদে গমনের ধারণাটি সঠিক নয়। নবীজি (সা.)-এর পরে যেহেতু আর ওই প্রয়োজন বাকি ছিল না এবং যুগের পরিবর্তনে নিরাপদে গমনের পরিবেশ ও বিনষ্ট হয়ে যায়, তাই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে মহিলাদের মসজিদে গমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়, পরবর্তীতে যুগ যুগ ধরে এ ধারা অব্যাহত আছে, তাই মহিলাদের মসজিদে গমন নিষিদ্ধ হওয়া বর্তমান যুগের নতুন কোনো বিষয় মনে করার অবকাশ নেই। বরং চৌদ্দ শত বছর যাবৎ চলে আসা নিয়ম ভেঙে মহিলাদের মসজিদে আনার তৎপরতা নতুন কোনো ফেতনার বিকাশ ঘটাবে। (বোখারী শরীফ-১৪০, আবু দাউদ শরীফ-১২৬, বাদায়েউস সানায়ে-১/১৫৭)

সামগ্রিক জীবনে নবীজি (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

একজন মানুষ, তিনি আবার মুসলমানও। এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কিই বা হতে পারে। কারণ ইসলাম একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা আল্লাহ তা'আলাহপ্রদত্ত ঐশী শিক্ষা, যা রাসূল (সা.)-এর বাস্তব আমল এবং বক্তব্যের মাধ্যমে প্রবর্তিত ও সারা দুনিয়ায় প্রসারিত হয়েছে। যে শিক্ষার প্রতিটি বিষয়ই স্পষ্ট এবং অপূর্ব-অনন্য। চলমান বস্তুবাদিতার জয়জয়কারেও এই সত্যটির কোনোই বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা যদি আকায়ে দুজাহান হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামগ্রিক শিক্ষা ও আদর্শের দিকে নজর ফেরাই পরম সত্যটি আরো উদ্ভাসিত হয়।

নববী শিক্ষার যে অসীম পরিধি তা বিবেচনা করলেই ইসলামের হক্কানিয়্যাত ও সর্বোচ্চ মর্যাদা অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের মরু প্রান্তরে রাসূল (সা.)-এর মোবারক আগমন। তৎকালীন ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অবস্থানের দিকেই ফিরে যাই। যখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং জীবনমানের বর্তমান উন্নয়ন–এককথায় কিছুই ছিল না। উক্ত যুগের সাথে রাসূল (সা.)-এর সামগ্রিক শিক্ষার অসীম পরিধিকে মেলাতে গেলেই একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নির্দ্বিধায় বলতে পারবে এসব কোনো মানবীয় গবেষণার ফসল হতে পারে না। সম্ভব নয়।

অধিকন্তু রাসূল (সা.) পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'উম্মি' ছিলেন। তৎকালীন সকল গণমানুষও এর পরম সাক্ষী। উম্মি বলতে তিনি সচরাচর ইলম শেখেননি। পার্থিব নিয়মে তিনি কোনো প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেননি। এতেই বোঝা যায়, এই শিক্ষা ও আদর্শের মূল ভিত্তি ছিল ঐশী বাণী তথা সরাসরি আল্লাহপ্রদত্ত ইলম। যার কারণে রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের কোনো পরিধি এবং পরিসীমা নেই। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ নতুন যত সমস্যাই আসুক এর সমাধান তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের মাঝে খুঁজে পাবে। এই বাস্তবতার নিরিখেই ইসলাম ঘোষণা করতে পেরেছে 'ইসলাম সর্বকালের সর্বলোকের সর্বজনীন এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা'। পৃথিবীর বুকে একক ব্যক্তির পক্ষ হতে সঠিক ধারাপরম্পরায় আগত এমন পরিপূর্ণ, সর্বজনীন এবং সামগ্রিক শিক্ষার আর দ্বিতীয়টি নেই, কিয়ামত পর্যন্তও আসবে না। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর ঘোষণাও তাই। সে কারণেই আমরা মানুষ, আবার মুসলমানও, আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি অনন্য নিয়ামত এবং আমাদের ওপর তাঁর অসীম করুণা!

এখন বিবেচনার বিষয় হলো, যে মহান শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা বিশ্বমানবতার বিজয় সাধিত হয়েছিল, পৃথিবীর মানুষ অনন্য সুখ-শান্তির নীড় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, আমাদের যুগে এসে সেই শান্তির নীড়ই যেন অগ্নির লেলিহান শিখায় পরিণত। যাবতীয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার তীর যেন নিক্ষিপ্ত হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষায় দীক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম উম্মাহের প্রতি। যারা এসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের কথা আপাতত বাদই দিলাম, কিন্তু স্বয়ং মুসলমানগণ কি পারবে সম্পূর্ণরূপে এর দায় এড়াতে? তাদের বানোয়াট দাবির পেছনে কি স্বয়ং মুসলমানদের কোনো কীর্তি নেই? আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

আমরা মুসলমান। এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো, রাসূল (সা.)-এর যাবতীয় শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা আমলে আনার জন্য সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল হলো প্রতিটি মুসলমান তার আপন আপন জীবনে। অন্যকে এর প্রতি উৎসাহিত বা তা পালনের হুকুম করা, পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি সবই এর পরের স্তর। আর এটিই সফল এবং বাস্তব নিয়ম।

রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম এবং সলফে সালেহীন ইসলামের আলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে এবং বিশ্বজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন একমাত্র এই সঠিক পন্থাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমলে আনার কারণে। স্বয়ং রাসূল (সা.) সমস্ত শিক্ষা ও আদর্শ নিজে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তো নববী শিক্ষা নিজেদের জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পৃথিবীর ইতিহাসে একক এবং অনন্য নজির। কোনো নবী-রাসূল (আ.)-এর সাথী-সঙ্গীগণ এরূপ নজির স্থাপন করতে পারেননি। সলফে সালেহীনরাও একই পথে হেঁটেছেন। যার কারণে দেড় হাজার বছর পরেও আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারছি আল্লাহ তা'আলা ইসলাম যেভাবে তাঁর নবী (সা.)-কে দিয়েছেন হুবহু সেভাবেই সঠিক ইসলাম আমরা পেয়েছি। এ ব্যাপারে কোনো প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই। বরং সন্দেহ পোষণ করলে মুসলমান স্বয়ং ইসলাম থেকেও খারিজ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, তোমরা নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। আরেকটি নির্দেশ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। এসব নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি আমরা প্রত্যেকে নিজেরা। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর যাবতীয় শিক্ষা সর্বপ্রথম এবং সবার আগে আমরা প্রত্যেকের নিজেকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। সমস্ত আদেশ-নিষেধ প্রয়োগের স্থল নিজেদেরই মনে করতে হবে। যত দিন এই নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে না, তত দিন মহানবী (সা.)-এর এই অসীম শিক্ষার ফলাফল এবং সৌন্দর্য বিশ্বমানবতার মাঝে অচর্চিতই থেকে যাবে। আর আমরা হয়ে পড়ব নামেমাত্র মুসলমান।

আমরা আজকের আয়োজনে রাসূল (সা.)-এর সামগ্রিক শিক্ষা ও আদর্শের কিছু নমুনা অতি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব। যাতে আমরা চিন্তা করতে পারি, এসব শিক্ষার কোন কোন

বিষয়টি আমাদের মাঝে আছে, কোন বিষয়টি নেই। কোন বিষয়টি আমার কাছে নেই; কিন্তু অন্যের কাছে আমি আশা করি। চিন্তা করতে পারব, যে বিষয়টি আমার কাছেই নেই আমি নিজের জীবনে আমলেই না নিয়ে সেই বিষয়টি অন্যের কাছে আশা করার অধিকার আমি রাখি কি না।

রাসূল (সা.)-এর যাবতীয় শিক্ষাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ১। আকাইদ, ২। ইবাদত, ৩। মুআমালাত ও ৪। মুআশারাত। এসব বিষয়ে ইসলাম কিছু জিনিস ফরয-ওয়াজিব করেছে, কিছু বিষয় রয়েছে অতি ফজীলতপূর্ণ। কিছু বিষয় আছে দায়িত্ব। ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষার বিক্ষিপ্ত কিছু বিষয়ের নমুনা হাদীসের ভাষায় পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

ইখলাস বা যেকোনো কাজ একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সকল আমলের ভিত্তি নিয়্যাতের ওপর। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আকৃতি এবং সম্পদ দেখেন না বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তর এবং আমল দেখেন। (মুসলিম শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ওই আমলকেই পছন্দ করেন, যা খাঁটি এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। (নাসাঈ শরীফ)

☆ আরেক হাদীসে এসেছে, যে লোক আখিরাতের কোনো আমল দুনিয়ার জন্য করে আখিরাতে তার কোনো সাওয়াব পাবে না। (মুসনাদে আহমদ)

ওজুর গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সরল পথে থাকো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, নেক আমল করতে থাকো, ভালো কাজ গ্রহণ করো। জেনে রেখো, তোমাদের সবচেয়ে উত্তম আমল হলো নামায, আর ওজুকে সংরক্ষণ করে মুমিনগণ। (মুসনাদে আহমদ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, পরিপূর্ণ ওজু করার কারণে কিয়ামতের দিন চেহারা এবং হাত-পা আলোকিত হবে। সুতরাং যারা এই আলো বৃদ্ধি করার শক্তি রাখো নিশ্চয়ই এই কাজ করো। (বোখারী শরীফ)

☆ যে ব্যক্তি ওজু শেষ করার পর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়েই ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম)

মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে সেরূপ একটি ঘর বানাবেন। (বোখারী শরীফ)

আযানের গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা উচ্চস্বরে আযান দাও। মানুষ বা অন্য যা কিছু এই আযান শুনবে সবই কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মুয়াজ্জিনকে আযান বলার কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং সকল মাখলূক তার পক্ষে সাক্ষী হবে। (আবু দাউদ)

আযানের জবাব দেওয়া :

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আযানের জবাব দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম শরীফ)

আযানের পর দরূদ ও দু'আ পড়া :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আযানের পর যে দু'আ পড়বে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসলিম শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা যখন আযান শুনবে তখন তোমরাও সে বাক্যগুলো বলো, যা মুয়াজ্জিন বলে থাকে। অতঃপর আমার ওপর দরূদ পাঠ করো। যে আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ১০টি রহমত নাযিল করেন। আমার জন্য আল্লাহর কাছে উসিলার প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই এটি জান্নাতের সুউচ্চ মকাম। এটি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু এক ব্যক্তিই পাওয়ার যোগ্য। আমার আশা সেই বান্দা আমিই হব। যে ব্যক্তি আমার জন্য উসিলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফ)

জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, জামা'আতের সাথে নামায পড়া ঘরে বা বাজারে নামায পড়ার চেয়ে ২৫ গুণ বেশি ফজীলত রাখে। কারণ কোনো লোক ভালো করে ওজু বানিয়ে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে মসজিদের দিকে রওনা দেয় তবে তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন। মসজিদে প্রবেশ করে যখন নামাযের জন্য অপেক্ষা করে তখন ওই সময়গুলোও নামাযে গণ্য করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের স্থানে বসে থাকে ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তার ওপর রহম করুন। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য মেহমানী তৈরি করেন। যখনই সে মসজিদে যায়। (বোখারী শরীফ)

প্রথম কাতারে নামায আদায় করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা যদি জামা'আতের প্রথম কাতারের ফজীলত সম্পর্কে অবগত হতে, তবে তাতে অংশগ্রহণের জন্য লটারির প্রয়োজন হতো। (মুসলিম শরীফ)

নারীদের ঘরের অন্দরমহলে নামায পড়ার গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, নারীদের ঘরে নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়া থেকে উত্তম, ঘরের অন্দরমহলে নামায আদায় করা ঘরে নামায আদায়ের চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ শরীফ)

☆ উম্মে হুমাইদ (রা.) রাসূল (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি আপনার সাথে জামা'আতে নামায আদায় করতে পছন্দ করি। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–আমি জানি, তুমি আমার সাথে নামায আদায় করা পছন্দ করো। কিন্তু তোমার নামায বারান্দার চেয়ে ঘরে উত্তম, বারান্দার নামায সেহেনের নামায থেকে উত্তম এবং সেহেনের নামায নিজের এলাকার মসজিদ থেকে উত্তম। আর নিজের মসজিদের নামায আমার মসজিদ থেকে উত্তম। তখন তিনি নিজের জন্য ঘরের অন্দরমহলে নামাযের স্থান বানিয়ে নিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত স্থানে নামায আদায় করেছেন। (মুসনাদে আহমদ)

মিসওয়াক করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যদি

আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট অনুভব না করতাম তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) বলেন, মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। (নাসাঈ শরীফ)

পেরেশানির সময় নামায আদায় করা :

☆হযরত হুজায়ফা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) কোনো পেরেশানির সম্মুখীন হলে নফল নামায আদায় করতেন। (আবু দাউদ শরীফ)

জুমু'আর দিনের গুরুত্ব :

☆ রাসূর (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, নিজের সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করে, তেল অথবা খোশবু ব্যবহারে এবং জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য ঘরে থেকে বের হয়, মসজিদের বসার জন্য দুই ব্যক্তিকে পৃথক না করে (বরং যেখানে জায়গা পায় বসে যায়), সাধ্যমতো নামায আদায় করে এবং ইমাম খুতবা শুরু করলে চুপ থাকে তবে ওই ব্যক্তির পরের জুমু'আ পর্যন্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

জুমু'আর দিন সূরায়ে কাহাফ পাঠ করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরায়ে কাহাফ তিলাওয়াত করবে তার জন্য দুই জুমু'আর মধ্যকার সময়টি আলোকিত হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

☆ জুমু'আর দিনের একটি সময় :

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, জুমু'আর দিন ১২ ঘণ্টা। এর মধ্যে (একটি সময়) মুসলমান আল্লাহ তা'আলার কাছে যা চায় তা তিনি দান করেন। সুতরাং তোমরা এই সময়টা আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তালাশ করো। (আবু দাউদ শরীফ)

ইস্তিখারার গুরুত্ব :

☆ হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে সব সময় ইস্তিখারার দু'আ শিক্ষা দিতেন যেমন কোরআন শিক্ষা দিতেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করতেন, তোমরা যদি কোনো জরুরত বা হাজতের সম্মুখীন হও তবে দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করো। অতঃপর এই (ইস্তিখারার)দু'আ পাঠ করো। (বোখারী শরীফ)

তাহাজ্জুদ আদায়ের গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে রাতে জাগ্রত থেকে নামায আদায় করে এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগ্রত করে। (আবু দাউদ শরীফ)

☆ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাতে জাগ্রত হওয়ার আমল ছেড়ো না। কারণ রাসূল (সা.) কখনো এই আমল ত্যাগ করেননি। যখন অসুস্থ হয়ে দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন রাসূল (সা.) বসে ওই নামায আদায় করতেন। (আবু দাউদ শরীফ)

ঘুমানোর সময় শেষ রাতে ওঠার নিয়্যাত করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় রাতে উঠে নামায আদায় করার নিয়্যাত করল কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে পারল না তবে উক্ত নিয়্যাত মতে সে সাওয়াব পাবে। তার ঘুমটি আল্লাহ পক্ষ থেকে তার জন্য সদকা। (নাসাঈ শরীফ)

চাশতের নামায :

☆ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে জীবনে তিনটি কাজ না ছাড়ার ওসিয়ত করেছেন। প্রত্যেক মাসে তিন রোযা, চাশতের নামায এবং বিতির আদায় করে ঘুমানো। (বোখারী শরীফ)

সিজদায়ে তিলাওয়াতের গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা দেয় তখন শয়তান পৃথক হয়ে কাঁদতে থাকে, আফসোস! আদম সন্তানকে সিজদার হুকুম দেওয়া হলে সে সিজদা করে জান্নাতের ভাগী হয়ে গেল, যখন আমাকে সিজদার হুকুম করা হয়েছিল তখন আমি তা না করে জাহান্নামের ভাগী হয়ে গেলাম। (মুসলিম শরীফ)

মুসলমানদের পরস্পর মুহাব্বত ও দেখাশোনা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মুসলমানের পরস্পর মমতা, ভালোবসা ও স্নেহের উপমা এক দেহের মতো। যার অঙ্গ অসুস্থ বা ব্যথিত হওয়ার কারণে অন্য অঙ্গে তার প্রভাব দেখা দেয়। (বোখারী শরীফ)

অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা করে বা কোনো দ্বীনি ভাইয়ের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষাৎ করল তখন জনৈক আহ্বানকারী বলে থাকে, তুমি ধন্য, তোমার চলা ভালো হয়ে গেছে এবং তুমি নিজের জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়ে নিলে। (তিরমিযী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো রোগীর শুশ্রূষা করে সে মূলত জান্নাতের তাজা ফল কুড়াতে আত্মনিয়োগ করে। (মুসলিম শরীফ)

সবর এবং শোকর :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মুমিনের প্রতিটি অবস্থা আশ্চর্যজনক যে, তার প্রতিটি কাজে কল্যাণ রয়েছে। এটি শুধু মুমিনদের বৈশিষ্ট। যদি সে সুখী হয় শোকর আদায় করে। তখন এই শোকর তার জন্য কল্যাণকর। যদি কষ্টে পতিত হয় সে সবর করে। এই সবর তার জন্য কল্যাণকার। (মুসলিম শরীফ)

পাঁচ প্রকারের শহীদ :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, শহীদ পাঁচ প্রকারের। ১। মহামারী রোগে মৃত ব্যক্তি, ২। পেটের অসুস্থতায় মৃত ব্যক্তি, ৩। ডুবে মৃত্যুবরণকারী, ৪। দেয়াল বা ঘরধসে তার নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী এবং ৫। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ব্যক্তি। (বোখারী শরীফ)

দীর্ঘ বয়সের ফজীলত :

☆ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে উত্তম কে? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে দীর্ঘজীবী এবং আমল ভালো। জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি কে? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে দীর্ঘজীবী কিন্তু আমল খারাপ। (তিরমিযী শরীফ)

ফিতনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মুমিনের মৃত্যু উত্তম

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, দুই বস্তু মুমিন পছন্দ করে না। ১। মৃত্যু, অথচ মুমিনের জন্য ফিতনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভালো, ২। সম্পদ কম হওয়া, অথচ কম সম্পদের হিসাবও কম হবে। (মুসনাদে আহমদ)

মৃত্যুর পূর্বে নেক আমলের তাওফীক হওয়া :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তার কাছ থেকে কাজ নেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে কাজ নেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেক আমলের তাওফীক দেন। (মুসনাদে আহমদ)

ঋণমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুর ফজীলত :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে

ব্যক্তি তিন বস্তু তথা অহমিকা, খিয়ানত এবং ঋণমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমদ)

মুমিনের প্রাণ ঋণের জন্য ঝুলে থাকে :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণ অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ মুমিনের জান ঝুলে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

জানাযার নামাযের গুরুত্ব :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে মুমিন ব্যক্তি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যাতে মৃত ব্যক্তির সাথে যাবে, জানাযা আদায় করবে এবং দাফন কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকবে সে দুই কিরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। (বোখারী শরীফ)

কবর যিয়ারত :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কবর যিয়ারত তোমাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করে। (নাসাঈ শরীফ)

মাতা-পিতার জন্য সন্তানের দু'আ :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে নেক বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তখন সে বলে–হে আমার রব! আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল কী কারণে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার জন্য তোমার সন্তান এস্তেগফার করার কারণে। (মুসনাদে আহমদ)

গায়েবানায় অন্য মুসলমানের জন্য দু'আ

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মুসলমান ভাই অপর ভাইয়ের জন্য গায়েবানায় দু'আ করলে তা কবুল হয়। (মুসলিম শরীফ)

রোযা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষের সমস্ত আমল তার নিজের জন্য আর রোযা শুধু আমার জন্য, আমি নিজেই এর বদলা দেব এবং রোযা হলো ঢালস্বরূপ। (বোখারী শরীফ)

রমাজানের শেষ ১০ দিন :

☆ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রমাজান মাসের শেষ ১০ দিন আরম্ভ হলে রাসূল (সা.) কোমর বেঁধে ইবাদতে নেমে যেতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। (বোখারী শরীফ)

যাকাত :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তিন কথার ওপর আমল করেছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো খুশিমনে যাকাত আদায় করা। (সুনানে কুবরা)

চাঁদা তুলে আমানদারীর সহিত ব্যয় করা

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যদি আমানতদার মুসলমান কেরানি নিজের মালিকের হুকুম মোতাবেক পুরোপুরি খুশিমনে তা আদায় করে, যা তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সেও সদকাকারী হিসেবে গণ্য হবে। (বোখারী শরীফ)

☆ হযরত রাফে ইবনে খদিজ বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি আমনতদারীর সহিত সদকা উসূল করে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা জিহাদ করার সমমূল্য। (আবু দাউদ শরীফ)

সুস্থাবস্থায় সদকা করা :

☆ রাসূল (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, সাওয়াব এবং প্রতিদান হিসেবে সবচেয়ে বড় সদকা কোনটি? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, এমন অবস্থায় সদকা করা, যখন তুমি সুস্থ। সম্পদের লোভ তোমার মধ্যে অধিক। (বোখারী শরীফ)

সদকার গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সদকা-খয়রাতে সম্পদ কমে না। (মুসলিম শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক লোক নিজের সদকার ছায়াতলে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ)

গোপনে সদকা করা উত্তম :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ৭ প্রকারের ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, তার মধ্যে একজন হলো যে গোপনে সদকা করে, এমনকি তার বাম হাতও জানে না যে, তার ডান হাত কী খরচ করেছে। (বোখারী শরীফ)

নিজের পরিবারের জন্য খরচ করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মানুষ যা নিজের পরিবারের জন্য সাওয়াবের নিয়্যাতে খরচ করে তা তার জন্য সদকা হিসেবে পরিগণিত হয়। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেটাই খরচ করো তার সওয়াব পাবে। এমনকি এক গ্রাস খানা, যা নিজের স্ত্রীর মুখে দিয়ে থাকো তাও। (বোখারী শরীফ)

দুশমন আত্মীয়ের প্রতি খরচ করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, দুশমন আত্মীয়স্বজনের জন্য খরচ করা উত্তম সদকা। (মুসতাদরাকে হাকেম)

উত্তম কথা বলাও সদকা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, প্রতিদিন সবার জন্য তার প্রত্যেক জোড়ার তরফ থেকে সদকা করা জরুরি। দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করাও সদকা, কোনো লোককে নিজের বাহনে স্থান দেওয়াও সদকা, উত্তম কথা বলাও সদকা, নামাযের জন্য যে কদম ওঠে তার প্রতিটি সদকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সদকা। আরেক বর্ণনায় আছে, মানুষকে রাস্তা বাতলিয়ে দেওয়াও সদকা। (বোখারী শরীফ)

হাসিমুখে সাক্ষাতের গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো ভালো কাজকে ছোট মনে করো না। এমনকি মুসলমান ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও সদকা। (মুসলিম শরীফ)

বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো মুসলমান বৃক্ষরোপণ করলে বা ক্ষেত-খামার করলে তা থেকে পশুপাখি বা মানুষ যা খায়–সবই তার জন্য সদকাস্বরূপ। (বোখারী শরীফ)

ভিক্ষাবৃত্তি :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে লোক ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহ তাকে তাওফীক দেন। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করাও উত্তম। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ওপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। (মুসলিম শরীফ)

ধনী হওয়া :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ধন-সম্পদ বেশি হওয়ার অর্থ ধনী হওয়া নয় বরং প্রকৃত ধনী হলো, যার অন্তর বড়। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ওই লোকই সফল, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনমতো রিযিকপ্রাপ্ত হয়েছে এবং

আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দিয়েছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দিয়েছেন। (মুসলিম শরীফ)

হজ :

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ করেছে, তাতে কোনো অশ্লীল ও অনর্থক কথা বলেনি এবং কোনো গোনাহ করেনি তবে সে নবজাতক শিশুর ন্যায় পাক-পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরবে। (বোখারী শরীফ)

হাজীগণ আল্লাহর মেহমান :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর মেহমান। মুজাহিদ, হাজী এবং উমরা আদায়কারী। (নাসাঈ শরীফ)

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে নামায আদায়ের ফজীলত :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমার মসজিদে নামায আদায় মক্কা শরীফ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। আর মসজিদুল হারামে নামায আদায় করা অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লাখ গুণ উত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

মদীনা শরীফে অবস্থান এবং সেখানে মৃত্যুবরণে গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে কষ্ট সহ্য করে মৃত্যু পর্যন্ত সবর করেছে কিয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী হব। (মুসলিম শরীফ)

জিহাদের গুরুত্ব :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ নামায এবং এর উচ্চতা হলো জিহাদ। (তিরমিযী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সমস্ত মখলুকের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে ওই ফকীর মুহাজিরগণ যাদের দ্বারা সীমান্ত রক্ষা করা হয়। (মুসনাদে আহমদ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর জামানতে থাকে, মসজিদে গমনকারী ব্যক্তি, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এবং হজের উদ্দেশ্যে গমনকারী। (মুসনাদুল হুমাইদী)

☆ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ রাস্তায় জিহাদের সমান কোনো আমল আছে? রাসূল (সা.) বলেন, তুমি এর শক্তি রাখো না। এরূপ তিনবার প্রশ্ন করলেন এবং প্রত্যেকবার রাসূল (সা.) এই কথা বললেন। তৃতীয়বার রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তির উপমা হলো, ওই রোযাদার যে রাত্রজাগরণ করে, আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করে, রোযায় সে ক্লান্ত হয় না এবং নামাযেও ক্লান্ত হয় না। (মুসলিম শরীফ)

বার্ধক্যের ফজীলত :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সাদা চুল উপড়ে ফেলো না। কারণ কিয়ামতের দিন তা নূর হবে। যে মুসলমানের একটি চুল সাদা হয়েছে তার বদলায় তাকে একটি সাওয়াব দেওয়া হবে, একটি গোনাহ মাফ করা হবে এবং একটি মর্যাদা দান করা হবে। (সহীহে ইবনে হিব্বান)

শহীদের ফজীলত :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমি রাতে দেখলাম দুই ব্যক্তি আমাকে সাথে করে নিয়ে গেল এবং আমাকে নিয়ে বৃক্ষে উঠল। অতঃপর এমন ঘরে আমাকে প্রবেশ করল, যা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এবং অতি শানদার। এরূপ সুন্দর ঘর আমি আর কোনো সময় দেখিনি। তারা বলল, এটি শহীদদের ঘর। (বোখারী শরীফ)

শাসক :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ৭ প্রকারের ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন আর কিছুর ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হলো ন্যায়বিচারক শাসক। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ইমাম (রাষ্ট্র পরিচালক) হলো ঢাল। তার তত্ত্বাবধানে কিতাল-জিহাদ করা হয়। তার মাধ্যমে দুশমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং সে যদি তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ন্যায়বিচার করে তবে এর বদলা ও সাওয়াব পাবে আর যদি অন্য কিছুর নির্দেশ দেয় তবে তার বিপদ হবে। (মুসলিম শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের কল্যাণ চান তবে তার জন্য উত্তম মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যদি সে কোনো কিছু ভুলে যায় তারা স্মরণ করিয়ে দেয়, যদি তার সব কিছু স্মরণ থাকে তারা তাকে সহযোগিতা করে। (সুনানে নাসাঈ)

পদ বা ক্ষমতাপ্রার্থী না হওয়া :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আব্দুর রহমান! এমারত (রাষ্ট্র ক্ষমতার দায়িত্ব)-এর প্রার্থী হয়ো না। যদি তোমার প্রার্থিতার কারণে তা অর্জিত হয় তবে এর সব দায়দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তাবে। যদি প্রার্থী না হয়ে তোমার হস্তগত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন। (বোখারী শরীফ)

ক্ষমতাসীনদের কল্যাণ কামনা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তিন বস্তু পছন্দ করেন আর তিন বস্তু অপছন্দ করেন। যা পছন্দ করেন–১। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। ২। আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। ৩। রাষ্ট্রপ্রধানদের কল্যাণ কামনা করো।

যে তিন জিনিস পছন্দ করেন না–১। শোনা কথা যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রচার করা, ২। অতি প্রশ্ন করা এবং ৩। সম্পদ নষ্ট করা। (মুসলিম শরীফ)

জালিমের সহযোগিতা না করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান আসবে, যারা তাদের মিথ্যার সত্যায়িত করবে এবং তাদের জুলুমের সহযোগিতা করবে তারা আমার নয় এবং আমিও তাদের নই। তারা হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলতে পারবে না। যারা তাদের মিথ্যার সত্যায়ন করবে না, তাদের জুলুমে সহযোগিতা করবে না তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা হাউজে কাউসারে আমার কাছে আসতে পারবে। (নাসাঈ শরীফ)

যথাসাধ্য মুসলমানদের কল্যাণ কামনা :

☆ হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর হাতে নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ করার বাইয়াত গ্রহণ করেছি। (বোখারী শরীফ)

হক কথা বলা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, জালিম শাসকের সামনে হক বলা জিহাদের শামিল। (তিরমিযী শরীফ)

দণ্ডবিধি প্রয়োগ :

☆ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একটি দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা দুনিয়াবাসীর

জন্য চল্লিশ রাতের বৃষ্টি থেকে উত্তম। (সুনানে নাসাঈ)

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো :

☆ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, ঈমানের ৭০টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। (বোখারী শরীফ)

হালাল আয়-উপার্জন :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে উপার্জিত টাকার চেয়ে পবিত্র খানা ভক্ষণ করেনি। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ.) নিজের হাতে উপার্জন করেই খেয়েছেন। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, উত্তম উপার্জন হলো নিজের হাতের উপার্জন। যদি সে মুখলিস হয়। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যবসা-বাণিজ্য :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহগার হিসেবে উঠবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করেছে এবং সত্য পথ অবলম্বন করেছে। (তিরমিযী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে কোনো মুসলমানের ক্রয়কৃত বস্তু (প্রয়োজনে) ফেরত নিতে সম্মত হবে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ ক্ষমা করবেন। (আবু দাউদ শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে বেচাকেনা এবং কর্জ আদায়ের সময় নম্রতা অবলম্বন করে। (বোখারী শরীফ)

বেচাকেনায় মাপজোখ :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, দানাজাত বস্তু মাপজোখ করো। তোমাদের বরকত দেওয়া হবে। (বোখারী শরীফ)

কর্জে হাসানার ফজীলত :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে দুইবার কর্জ প্রদান করবে তার একবার সদকা করার মতো। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

কর্জ থেকে আশ্রয় চাওয়া :

☆ রাসূল (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি করজ থেকে বেশি আশ্রয় চান। রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয়ই লোক যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন সে কথাবার্তায় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদাখেলাফ করে। (বোখারী শরীফ)

ঋণ শোধ করার ইচ্ছা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে লোক ঋণ শোধ করার নিয়্যাতে ঋণ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঋণ শোধ করে দেন এবং যে না দেওয়ার নিয়্যাতে ঋণ করে আল্লাহ তার ঋণ শোধ করে না। (বোখারী শরীফ)

উত্তম রূপে ঋণ শোধ করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, উত্তম লোক ওই ব্যক্তি, যে উত্তম রূপে ঋণ শোধ করে। (মুসলিম শরীফ)

অপারগের কর্জ মাফ করে দেওয়া :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি মানুষকে ঋণ দিত। যদি কেউ ঋণ আদায়ে অপারগ হতো গোলামদের বলত তাকে মাফ করে দাও হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমাকেও ক্ষমা করে দেবেন। সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। (বোখারী শরীফ)

জন্তু পরিপালন :

☆ হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) তাঁকে বলেছেন, বকরি পালন করো। কারণ তাতে বরকত আছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, উট পরিবারের সম্মানের পাত্র, বকরি বরকতময়, ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মোরগকে গালি দিও না। কারণ সে নামাযের জন্য জাগিয়ে তোলে। (আবু দাউদ শরীফ)

বিয়ে :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে বিয়ে করো। কারণ বিয়ে হলো লজ্জা, সততা, সম্মান এবং পবিত্রতা রক্ষাকারী। (সুনানে নাসাঈ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, চার বস্তুর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে–১। মুত্তাকী নারী, ২। প্রশস্ত বাসস্থান, ৩। ভালো প্রতিবেশী ও ৪। ভালো বাহন। (সহীহে ইবনে হিব্বান)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ধরনের মানুষের সাহায্য করা আল্লাহ দায়িত্ব। তার মধ্যে একটি হলো যে ব্যক্তি নিজের পবিত্রতা রক্ষার্থে বিয়ে করে। (তিরমিযী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, উত্তম বিয়ে হলো যে বিয়ে (ব্যয়ের দিক থেকে) সহজতর হয়। (সহীহে ইবনে হিব্বান)

পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহার :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন তারা, যারা উত্তম চরিত্রবান এবং নিজেদের স্ত্রীদের প্রাপ্য আদায় করার ক্ষেত্রে উত্তম। (তিরমিযী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে নিজের স্ত্রীর জন্য ইখলাসের সহিত খরচ করবে সেটি তার জন্য সদকা। (বোখারী শরীফ)

কোরআন শিক্ষা করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, উত্তম ব্যক্তি হলো যে কোরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করে এবং ভালোভাবে হেফজ করে (কিয়ামতের দিন) সে সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে, তা স্মরণ করে এবং এর জন্য কষ্ট করে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই কিছু আল্লাহওয়ালা আছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন তারা কারা? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, হামিলীনে কোরআন বা কোরআন ধারণকারী। তারা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

সুকণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই সুকণ্ঠ কোরআনের সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করে দেয়। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, পবিত্র কোরআনকে নিজেদের কণ্ঠে অলংকৃত করো। (বোখারী শরীফ)

উত্তম কারী :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সুন্দর কোরআন তিলাওয়াতকারী, (কারী) ওই ব্যক্তি যে কোরআন পাঠ করার সময় তোমরা বুঝবে যে, তার মাঝে আল্লাহভীতি আছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

ইলম অর্জন :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে রাস্তায় চলে এর কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (মুসলিম শরীফ)
একই রেওয়ায়াতে আছে, নিশ্চয়ই তালিবে ইলমের জন্য ফেরেশতারা ডানা বিছিয়ে দেয়। (আবু দাউদ শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনি ইলমে তাফাক্কুহ তথা পারদর্শিতা দান করেন। (বোখারী শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মৃত্যুর পর মানুষের আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন বস্তুর সাওয়াব সে পেতে থাকে–১। সদকায়ে জারিয়া, ২। তার ওই ইলম, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় ও ৩। নেক সন্তান, যারা তার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম শরীফ)

দাওয়াত :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে হেদায়াতের প্রতি দাওয়াত দেয় তাকে ওই সকল লোকের সমান বদলা দেওয়া হয়, যারা তার দাওয়াতে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের বদলাতে কোনো কমতিও করা হয় না। যারা ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার দিকে দাওয়াত দেয় তাদেরও সে পরিমাণ গোনাহ দেওয়া হয়। (সহীহে মুসলিম)

ইলমের সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা (দ্বীনি ইলম) শ্রবণ করছো। তোমাদের শাগরেদ (তাবেঈগণ) তোমাদের কাছ থেকে শুনবে এবং তাদের শাগরেদগণ (তবেতাবেঈন) তাদের কাছ থেকে শুনবে। (আবু দাউদ)

কোরআন-সুন্নাহ :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা শক্ত করে ধরে রাখো তবে গোমরাহ হবে না। এই বস্তু হলো পবিত্র কোরআন এবং নবী (সা.)-এর সুন্নাত। (মুসতাদরাকে হাকেম)

সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা, বিদ'আত থেকে নিরাপদ থাকা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্ত করে ধারণ করো। নতুন কাজ তথা বিদ'আত থেকে নিরাপদ থাকবে, প্রত্যেক নতুন কাজ বিদ'আত এবং বিদ'আত হলো গোমরাহী। (আবু দাউদ শরীফ)

আল্লাহ তা'আলার যিকির :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার অনুমানের সাথে আছি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে আছি। (বোখারী শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যিকির করে আর যে ব্যক্তি যিকির করে না তাদের উপমা হলো জীবিত আর মৃতের ন্যায়। (বোখারী শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমার জিহ্বা যেন সব সময় আল্লাহর যিকিরে তরতাজা থাকে। (তিরমিযী শরীফ)

দু'আ :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, দু'আ ইবাদত। তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন, দু'আ করো তোমাদের দু'আ কবুল করব। (আবু দাউদ শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যতক্ষণ মুসলমান গোনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ করবে না, তার দু'আ কবুল করা হয়। (মুসলিম শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, বান্দা যদি ইয়াকীনের সাথে দু'আ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার চাওয়া পূরণ করে দেন। (মুসলিম শরীফ)

তাওবা-এস্তেগফার :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা এমন লোক পয়দা করবেন, যারা গোনাহ করবে অতঃপর তারা এস্তেগফার করবে, তখন তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসলিম শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মাঝে 'হালতে নেযা' পয়দা হয়। (তিরমিযী শরীফ)

দরূদ শরীফ :

☆রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ১০টি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ১০টি রহমত নাযিল করেন, ১০টি গোনাহ মাফ করেন এবং ১০টি সম্মানে ভূষিত করেন। (নাসাঈ শরীফ)

উত্তম চরিত্র :

☆রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যক্তি তার সদাচারের জন্য রোযাদার ও নামায আদায়কারী ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করে থাকে। (আবু দাউদ শরীফ)
☆ নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, মীযানে (পাল্লায়) ওজনের সময় সদাচারের চেয়ে অধিক ওজনবিশিষ্ট আর কিছু হবে না। (আবু দাউদ শরীফ)

বিনম্র ব্যবহার :

☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন নরম ব্যবহারকারী, তিনি নরম ব্যবহার পছন্দ করেন। আর তিনি নরম ব্যবহারকারীকে যে সাওয়াব দেন, কঠোর ব্যবহারকারীকে তা দেন না। (আবু দাউদ শরীফ)
☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নম্র স্বভাব হতে বঞ্চিত, সে সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (আবু দাউদ শরীফ)
☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর সাহাবীদের কাউকে কোথাও কোনো কাজের জন্য পাঠাতেন, তখন তিনি বলতেন, তোমরা সুসংবাদ দেবে এবং তাদের মাঝে ঘৃণার সঞ্চার করবে না। আর লোকদের সাথে নরম ব্যবহার করবে, কঠোর হবে না। (আবু দাউদ শরীফ)
☆ রাসূল (সা.) দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের কেউ কোনো কাজের দায়িত্বশীল হয় এবং অন্যকে কষ্টে ফেলে আপনিও তাকে কষ্টে ফেলেন। আবার বলেন, আমার উম্মতে যেকোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হয় এবং সে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করে আপনিও তার সাথে নম্র ব্যবহার করুন। (মুসলিম শরীফ)

সীমাহীন বন্ধুত্ব বা শত্রুতা :

☆হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নিজের বন্ধুর সাথে অতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবে না। হয়তো সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথেও অতিমাত্রায় শত্রুতা প্রদর্শন করবে না। হয়তো সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। (তিরমিযী শরীফ)

ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা :

☆ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, নম্র কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন

করা ওই দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। (বাকারা ২৬৩)

☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের শরীয়ত নির্ধারিত বিধান ব্যতীত অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। (আবু দাউদ শরীফ)

অনর্থক কথাবার্তা :

☆ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত। (মুমিন ১-৩)

কারো প্রশংসা করতে চাইলে :

☆ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে, তিনি তিনবার এরূপ বলেন, তুমি তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে। এরপর বলেন, তোমরা কেউ অপর কারো প্রশংসা করতে চাইলে এরূপ বলবে, আমি তাকে এরূপ মনে করি, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাকে নির্দোষ বলে ধারণা করি না। (আবু দাউদ শরীফ)

হাসি-মজা করে মিথ্যা না বলা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী ঘরের যিম্মাদার, যে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করে। আর যে ব্যক্তি হাসি-তামাশার মধ্যেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের উঁচুস্থানের একটির যিম্মাদার হব। আর যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য আমি জান্নাতের উচ্চতম স্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার। (আবু দাউদ শরীফ)

মানুষের শোকর আদায় করা :

☆ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহর শোকর আদায় করে না। (আবু দাউদ শরীফ)

সৎ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে সাথী না বানানো

☆ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মুমিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথী হবে না। আর মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়। (আবু দাউদ শরীফ)

কথা বলার নিয়ম :

☆ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথাবার্তা এত স্পষ্ট ছিল যে, যে কেউ তা শুনত, সে তা বুঝতে পারত। (আবু দাউদ শরীফ)

কাকে কেমন সম্মান দেওয়া উচিত :

☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, বয়স্ক মুসলিম, যে কোরআনের হাফেজ এবং সে তার অর্থের মধ্যে কোনোরূপ কমবেশি করে না এরূপ ব্যক্তি এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশার সম্মান করা মহান আল্লাহর সম্মানের ন্যায়। (আবু দাউদ শরীফ)

অনুমতি ব্যতীত দুজনের মাঝখানে না বসা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তির উচিত নয়, দুজনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা। (আবু দাউদ শরীফ)

সতর্কতা অবলম্বন :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুবার আঘাত প্রাপ্ত হয় না। (আবু দাউদ)

হাঁটার নিয়ম :

☆ নবী করীম (সা.) যখন চলতেন, তখন তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতেন। (আবু দাউদ)

একজনের কথা অপরজনকে না বলা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন কোনো ব্যক্তি কিছু বলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তা আমানতস্বরূপ । (আবু দাউদ)

চোগলখোরী :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু দাউদ)

অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ না করা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি যদি অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ করো, তবে তুমি যেন তার ক্ষতি করলে এবং এর ফলে সে আরো বিগড়ে যেতে পারে, (আবু দাউদ শরীফ)

অনুমান করে বিচার করা :

☆ নবী করীম (সা.) বলেন, হাকিম (বিচারক) যখন অনুমানের অনুসারী হবে এমতাবস্থায় সে লোকদের ধ্বংস করে ফেলবে। (আবু দাউদ শরীফ)

ভ্রাতৃত্ব :

☆ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাইস্বরূপ। কাজেই কেউ যেন কারো ওপর জুলুম না করে এবং কাউকে যেন বিপদের মধ্যে না ফেলে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব-অভিযোগ পূরণ করে, আল্লাহ্ তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট দূর করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে গোপন রাখবেন। (আবু দাউদ)

গালিগালাজ :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন দুই ব্যক্তি গালিগালাজ করে, তখন প্রথম গালিগালাজকারীর ওপর সে গোনাহ বর্তায়, যতক্ষণ না মাজলুম ব্যক্তি কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করে। (আবু দাউদ শরীফ)

বিনয় :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার ওপর ওয়াহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে। যাতে কেউ কারো ওপর বাড়াবাড়ি ও গৌরব প্রকাশ না করে। (আবু দাউদ শরীফ)

গীবত :

☆ একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! গীবত কী? তিনি বলেন, তোমার ভাই সম্পর্কে (তার অনুপস্থিতে) এমন কিছু বলা, যা শুনলে সে ব্যথিত হয়। তখন বলা হয়, আমি যে কথা বলি, তা যদি তার মধ্যে থাকে? (তবে কি গীবত হবে?) রাসূল (সা.) বলেন, তুমি যা বলছো, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে; আর সে দোষ যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তো তুমি তার ওপর বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ দিলে, (যা গীবত থেকে অধিক দোষণীয়)। (আবু দাউদ শরীফ)

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনা

করে কোনো লোকমা ভক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে ওই পরিমাণ লোকমা জাহান্নাম হতে ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনা করে কিছু পরিধান করবে, আল্লাহ্ তাকে সে পরিমাণ জাহান্নামের বস্ত্র পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ শরীফ)

প্রতিশোধ গ্রহণ :

☆ সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) বসেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে লক্ষ করে (কটূক্তি করে) তাঁকে কষ্ট দেয়। আবু বকর (রা.) তা শুনে চুপ করে থাকেন। সে ব্যক্তি তাঁকে দ্বিতীয়বার কষ্ট দিলেও তিনি চুপ করে থাকেন। এরপর সে তৃতীয়বার তাঁকে কষ্ট দিলে তিনি প্রতিশোধ নেন (অর্থাৎ তিনি তার কটূক্তির জবাব দেন।) আবু বকর (রা.) যখন কটূক্তির জবাব দিয়ে প্রতিশোধ নেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে যান। তখন আবু বকর (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমার ওপর রাগ করলেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আসমান থেকে একজন ফেরেশতা এসে ওই ব্যক্তিকে তোমার পক্ষ হতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল। কিন্তু তুমি নিজেই যখন জবাব দিলে, তখন শয়তান সেখানে এসে হাজির হয়ে গেল। আর শয়তান যেখানে আসে, আমি সেখানে বসতে পারি না। (আবু দাউদ শরীফ)

মৃতদের সম্পর্কে কটূক্তি না করা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কোনো সাথী মারা যাবে, তখন তোমরা তার নিন্দা করবে না এবং তার দোষত্রুটি প্রকাশ করবে না। (আবু দাউদ শরীফ)

বিদ্রোহ করা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বিদ্রোহ ও আত্মীয়তা-বিচ্ছেদ ব্যতীত এমন কোনো গোনাহ নেই, যার শাস্তি আল্লাহ্ আখিরাতে দেওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতেও দেন। (আবু দাউদ শরীফ)

অভিসম্পাত না করা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন কোনো ব্যক্তি কারো ওপর লা'নত করে, তখন তা আসমানের দিকে উত্থিত হয়। কিন্তু তা সেখানে পৌঁছবার আগেই আসমানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর তা ডান দিকে যেতে থাকে, কিন্তু তা সেদিকে কোনো পথ না পেয়ে, যার ওপর লা'নত করা হয় সে যদি তার উপযোগী হয়, তখন তা তার ওপর আপতিত হয়; অন্যথায় তা লা'নতকারীর ওপর গিয়ে বর্তায়। (আবু দাউদ শরীফ)

ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না, বরং তোমরা আল্লাহর বান্দায় পরিণত হও এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। আর কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সময় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখে। (আবু দাউদ শরীফ)

কুধারণা পোষণ :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে না। কেননা, এরূপ করা নির্ভেজাল মিথ্যাস্বরূপ। (আবু দাউদ শরীফ)

মুমিন মুমিনের আয়না :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এক মুমিন-অন্য মুমিনের জন্য দর্পণস্বরূপ এবং এক মুমিন-অপর মুমিনের জন্য ভাইস্বরূপ। কাজেই এক মুসলিমের উচিত, অপর মুসলিমের ক্ষতি হতে রক্ষা করা এবং তার অনুপস্থিতে সে ব্যক্তির জানমাল রক্ষা করা। (আবু দাউদ শরীফ)

আপস-মীমাংসা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, আমি কি তোমাদের নামায, রোযা এবং যাকাত হতে উত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবীগণ বলেন–হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তা হলো পরস্পরের মাঝে আপস-মীমাংসা করে দেওয়া। কেননা, পরস্পরের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ লোকদের ধ্বংস করে দেয়। (আবু দাউদ শরীফ)

গান-বাজনা :

☆ নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবন উমর (রা.) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে তাঁর কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেন। তিনি সেখান থেকে দূরে গিয়ে আমাকে বলেন, হে নাফে! তুমি কি এখনো কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ। আমি বলি, না। তখন তিনি তাঁর কান থেকে আঙুল বের করে বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি এরূপ শব্দ শুনে এরূপ করেন। (আবু দাউদ শরীফ)

দয়া ও করুণা :

☆ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, রহমকারীদের ওপর রহমান অর্থাৎ আল্লাহ্ রহম করেন। তোমরা জমীনবাসীদের ওপর রহম করো, তাহলে আসমানের অধিপতি আল্লাহ্ তোমাদের ওপর রহম করবেন। (আবু দাউদ)

বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ :

☆ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের হক আদায় করে না, অর্থাৎ সম্মান করে না, সে আমাদের হক আদায় করে না, অর্থাৎ সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ শরীফ)

নিজের প্রশংসা নিজে না করা :

☆ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা নিজেদের প্রশংসা করো না, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে ভালো তা খুবই ভালো জানেন। (আবু দাউদ শরীফ)

সব লোক ধ্বংস হয়ে গেছে বলা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন তুমি কাউকে এরূপ বলতে শুনবে, সব লোক ধ্বংস হয়ে গেছে, (তখন তুমি মনে করবে যে) তাদের মাঝে সে ব্যক্তিই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (আবু দাউদ শরীফ)

তদন্ত না করে কোনো কিছু বলা :

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তা-ই অন্যের কাছে বলে বেড়ায়। (আবু দাউদ শরীফ)

বানিয়ে স্বপ্ন বলা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, কিয়ামতের দিন তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে দুটি যবের মধ্যে গিট দেওয়ার জন্য, এটা সে কখনো করতে পারবে না। (আবু দাউদ শরীফ)

বংশগৌরব করা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ্ তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের মিথ্যা অহংকার এবং

বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব করাকে দূর করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ)

পক্ষপাতিত্ব :

☆ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তার কাওমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তার উদাহরণ এরূপ যে, যেমন কারো উট গর্তে পড়ে গেছে, আর সে তার লেজ ধরে টানছে। (আবু দাউদ শরীফ)

পরামর্শ একটি আমানত :

☆ রাসূলুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যার থেকে পরামর্শ নেওয়া হয়, সে একজন আমানতদারের মতো। (আবু দাউদ শরীফ)

ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কাউকে কোনো ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করবে, সে আমলকারীর সমান সাওয়াব পাবে। (আবু দাউদ শরীফ)

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, দু'আ তাকদীর বদলে দেয় আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের কারণে বয়স বৃদ্ধি পায়। (তিরমিযী শরীফ)

☆ বাহয ইবন হাকীম (রহ.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বলেন, তোমার মায়ের সাথে, এ রকম তিনবার বললেন, অতঃপর বললেন, তোমার পিতার সাথে। এরপর তোমার নিকটাত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (আবু দাউদ শরীফ)

মুশরিক পিতা-মাতার সাথে সুসম্পর্ক রাখা :

☆ হযরত আসমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.)-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি নবী (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনু 'উয়াইনাহ (রহ.) বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেই অল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি।' সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০/৮) (বোখারী শরীফ)

চাকর-চাকরানীর কাজে সহযোগিতা করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, এরা (দাস-দাসীরা) তোমাদের ভাই (বোন) স্বরূপ, যাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই, যার অধীনে তার কোনো ভাই থাকবে, তার উচিত–সে যা খায়, তাকে তাই খাওয়াবে; সে যা পরে, তাকে তাই পরাবে। আর সে যেন তাকে দিয়ে তার সামর্থ্যের বাইরে পরিশ্রম না করায় । আর যদি সে তাকে দিয়ে অধিক পরিশ্রম করাতে চায়, তবে সে যেন তাকে সাহায্য করে। (আবু দাউদ শরীফ)

আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট না দেওয়া :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহর মাখলুককে কষ্ট দেবে না। (আবু দাউদ শরীফ)

কারো বিরুদ্ধে উস্কানি দিলে :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী বা দাস-দাসীকে, তার স্বামী বা মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ শরীফ)

উঁকি মারা :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে, আর সে তার চোখ কানা করে দেয়, তবে এর কোনো বদলা নেওয়া হবে না। (আবু দাউদ শরীফ)

অনুমতি নেওয়ার নিয়ম :

☆ বনু আমেরের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চান, আর সে সময় তিনি তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন সে ব্যক্তি বলে, আমি কি ঘরে প্রবেশ করব? এ সময় নবী করীম (সা.) তাঁর খাদিমকে বলেন, তুমি এ ব্যক্তির কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দাও। আর তাকে, "আসসালামু আলাইকুম" বলে অনুমতি চাইতে বলো। সে ব্যক্তি এ কথা শুনে বলে, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি। তখন নবী করীম (সা.) তাকে অনুমতি দিলে সে ভেতরে প্রবেশ করে। (আবু দাউদ শরীফ)

কারো বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে কোথায় দাঁড়াতে হয় :

☆ আবদুল্লাহ্ ইবন বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখনই কারো দরজায় আসতেন, তখন তিনি দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং তিনি দরজার ডান অথবা বাম দিকে সরে দাঁড়াতেন এবং বলতেন–আসসালামু আলাইকুম! আসসালামু আলাইকুম! আর তিনি এরূপ এ জন্য করতেন যে, সে সময় দরজায় কোনো পর্দার ব্যবস্থা ছিল না। (আবু দাউদ শরীফ)

মহব্বত সৃষ্টি করার উপায় :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ওই জাতের কসম, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে। আর তোমরা ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরের সাথে মুহাব্বত রাখবে। আর আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তবে তোমাদের মধ্যে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। (আবু দাউদ শরীফ)

আগে সালাম দেওয়া :

☆ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ব্যক্তি উত্তম, যে আগে সালাম দেয়। (আবু দাউদ শরীফ)

ঢিল ছোড়া প্রসঙ্গে :

☆ আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল মুযানী (রহ.) বলেন, নবী করীম (সা.) ঢিল ছুড়তে নিষেধ করেছেন। (বোখারী শরীফ)

ভোগবিলাস :

☆ নবী (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বিলাসবহুল বাড়ি তার মালিকের জন্য শাস্তির কারণ হবে, তবে বসবাসের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, এরূপ বাড়ি নির্মাণে কোনো ক্ষতি নেই। (আবু দাউদ শরীফ)

প্রতিবেশী :

☆ একদা নবী করীম (সা.) ইরশাদ

করেন, আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে লোক? তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না। (বোখারী শরীফ)

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তুমি ঝোল (তরকারি) রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি করে দেবে। এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর পরিজনের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং তা থেকে তাদের কিছু সৌজন্যমূলক পৌঁছিয়ে দেবে। (মুসলিম শরীফ)

বিপরীত লিঙ্গের বেশ ধারণ করা :

☆ ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিসম্পাত করেছেন। (তিরমিযী শরীফ)

সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন করা :

☆ আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত। একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রশ্রাব করে দিল। লোকেরা উঠে তার দিকে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তার প্রস্রাব করায় বাধা দিও না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন। (বোখারী শরীফ)

পরিবারে চলার নিয়ম :

☆ আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা.) নিজ গৃহে কী কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হতো, তখন উঠে নামাযে চলে যেতেন। (বোখারী শরীফ)

ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা :

☆ আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর নিকট বলল, আপনি আমাকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার তা বললেন, নবী (সা.) প্রত্যেকবারই বললেন, রাগ করো না। (বোখারী শরীফ)

মধ্যপন্থা :

☆ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, সুস্থ মানসিকতা, জলদি না করা এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের চব্বিশ অংশের একটি। (তিরমিযী শরীফ)

প্রচারবিমুখতা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, বহু জীর্ণশীর্ণ, ধূলাময় ব্যক্তি আছে যাদেরকে দরজাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তারা যদি আল্লাহর ওপর কসম করেন তাদের কসম পূর্ণ করে দেওয়া হয়। (মুসলিম শরীফ)

উত্তম কথা বলা না হয় চুপ থাকা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মুমিনের উচিত উত্তম কথা বলা অন্যথায় খামোশ থাকা। (বোখারী শরীফ)

চুপ থাকাই নিরাপদ :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে নীরবতা গ্রহণ করল সে নাজাত পেল। (তিরমিযী)

ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে লোক নিজ মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার চেহরাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযী শরীফ)

উত্তম ইসলাম :

☆ জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তম ইসলাম কোনটি? রাসূল (সা.) বলেন, উত্তম ইসলাম হলো তোমরা অন্যকে খানা খাওয়াও এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম প্রদান করো। (বোখারী শরীফ)

মেহমানের ইজ্জত করা :

☆ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে এবং মেহমানকে সর্বপ্রকার মর্যাদা দান করে। (বোখারী শরীফ)

এপর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে নববী শিক্ষার কিছু বিষয় নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা হলো। রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার পরিধির কোনো সীমারেখা নেই। প্রত্যেক যুগে মুসলমানগণ যার যার মেধা-মনন অনুযায়ী তা থেকে উপকৃত হয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার প্রভাবে সারা দুনিয়ায় একসময় মানবতার জয়জয়কার হয়েছিল। সুখ-শান্তি এবং উন্নয়নের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। ইতিহাস এবং বর্তমান বাস্তবতাকে সমন্বয় করে দেখা হলে সহজেই অনুমান করা যায়, যতই মানুষ এই শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ততই মানবতার মাঝে হাহাকার দেখা দিয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিশ্বমানবতা এক অন্ধকার পরিণতির দিকেই ধাবিত হতে চলেছে। মুসলিমবিদ্বেষীরা ইসলামী শিক্ষা থেকে মানবতাকে বিচ্ছিন্ন করার বাহারি আয়োজন সম্পন্ন করেছে। যার প্রভাবে স্বয়ং একশ্রেণীর মুসলমানদের মাঝেও সৃষ্টি হয়েছে ধর্মবিমুখতা এবং উদাসীনতা। কিন্তু তাতে কার উপকার হয়েছে। কারা লাভবান হচ্ছে? সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে কেউ উপকৃত হয়নি এবং হতে পারে না। বরং ক্ষতি হচ্ছে পুরো দুনিয়ার। পুরো মানবতার।

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার সাফল্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন :

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

এবং 'স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সঞ্চার করলেন। তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাইয়ে পরিণত হলে। প্রকৃতার্থে তোমরা অবস্থান করছিলে অগ্নিকুণ্ডের প্রান্ত সীমায়। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও। (সূরা আল ইমরান : ১০৩)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নে তাওফীক দান করুন। আমীন।